মন্দ্রসপ্তক

হুমায়ূন আহমেদ

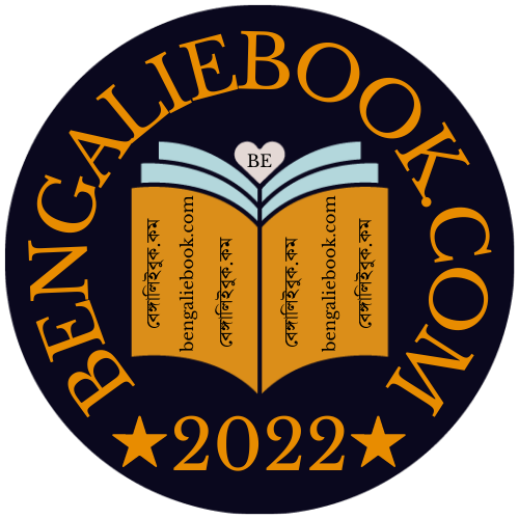

সূচিপত্র

১. সকালবেলাতেই মৃত্যুসংবাদ.....2

২. সেলুনে চুল কাটাতে.....24

৩. মৃত মানুষকে ভুলে যেতে.....47

৪. ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল.....61

৫. পরপর তিনটি অদ্ভূত চিঠি.....90

৬. আমরা ভয়াবহ যন্ত্রণায় ছিলাম.....105

৭. এক তোড়া গোলাপ.....121

৮. মজার একটা খবর পাওয়া গেল.....134

৯. মানুষের মন বড়ই বিচিত্র.....141

১. সকালবেলাতেই মৃত্যুসংবাদ

সকালবেলাতেই মৃত্যুসংবাদ।

টুথব্রাশে পেস্ট মাখাচ্ছি। অস্বস্তি নিয়েই মাখাচ্ছি—কারণ কার ব্রাশ ঠিক ধরতে পারছি না। এ বাড়িতে তিনটা সাদা রঙের টুথব্রাশ আছে যার একটা আমার। সেই একটা মানে কোনটা, আমি কখনো ধরতে পারি না। বাকি দুটার মালিক আমার দুবোন। এদের চোখের দৃষ্টি ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ–এরা দূর থেকে বলতে পারে ব্রাশটা কার। এই কারণে দাঁত মাজার পর্বটা আমি সাধারণত অতি দ্রুত সেরে ফেলি। বোনদের চোখে পড়ার আগেই। এরা বড় যন্ত্রণা করে।

আজ আমার পরিকল্পনা ছিল ধীরে-সুস্থে সব কাজকর্ম করা। দাঁত মাজার পর্বে মিনিট দশেক সময় দেবার কথা ভাবছিলাম। সম্ভব হল না। মীরা এসে বলল, দাদা শুনেছিস, মেজো খালু সাহেব মারা গেছেন।

আমি অসম্ভব অবাক এবং দঃখিত হবার ভাব করলাম। যেন পৃথিবীর সবচে ভয়াবহ খবর এইমাত্র শুনলাম। দুঃখের ভাবটাকে আরো জোরালো করার জন্যে কিছু একটা বলা দরকার। যেমন করুণ গলায় বলা, হোয়াট এ ট্রাজেডি কিংবা কী সর্বনাশ! এই দুটার মধ্যে কোনটা বলব ভাবছি, তখন মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুই আবার আমার ব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘষছিল? যেন এটাই বর্তমান সময়ের গ্রেট ট্রাজেডি। মেজো খালু সাহেবের মৃত্যুসংবাদ চাপা পড়ে গেল। আমি উদাসীন ভঙ্গিতে বললাম, এটা তোর নাকি?

ব্রাশের গায়ে M লেখা দেখছি না? গতকালও আমার ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলি। এইসব কী?

গতকাল তোর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলাম, তুই বুঝলি কী করে?

সিগারেটের গন্ধ থেকে বুঝেছি। ভক ভক করে সিগারেটের গন্ধ বের হয়।

মীরার দিকে তাকিয়ে মনে হল সে কেঁদে ফেলার একটা চেষ্টা করছে। আমার দুই বোন কাঁদার ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট। অতি তুচ্ছ কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে এরা কাঁদতে পারে। গত শুক্রবারে টিভি-র একটা নাটক দেখে এরা দুজনই এমন মায়াকান্না জুড়ে দিল যে, বড় চাচা ধমক দিয়ে বললেন—এসব হচ্ছে কী? এই, টিভি বন্ধ করে দে তো। এদের নিয়ে বড় যন্ত্রণা! আসলেই বড় যন্ত্রণা। একই চিরুনি দিয়ে সেও মাথা আঁচড়াচ্ছে, আমিও আঁচড়াচ্ছি, তাতে দোষ হচ্ছে না। ব্রাশের বেলায় একেবারে কেঁদে ফেলতে হবে।

আমি বললাম, কাঁদছিস কেন? কেঁদে ফেলার মতো কী হল?

মীরা জবাব না দিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। মীরা বয়সে আমার তিন বছরের ছোট। ওর এখন একুশ চলছে। যদিও চেহারায় খুকি খুকি ভাবটা রয়ে গেছে। শুধু চেহারায় না, স্বভাবেও। একদিন বাসায় এসেছে কাঁদতে কাঁদতে, কারণ এক রিকশাওয়ালা নাকি তাকে গালি দিয়েছে। বলেছে—এই ছেমরি। এক জন রিকশাওয়ালা কী করে মীরার মতো অত্যন্ত রূপবতী মেয়েকে এই ছেমরি বলতে পারে সে এক রহস্য। রূপবতীদের গালি দেয়া বেশ কঠিন। তাছাড়া মীরা শুধু রূপবতীই নয়, বাইরের লোকজনদের সঙ্গে তার ব্যবহারও খুব ভালো। কাজের লোক, রিকশাওয়ালা এদের সবাইকে সে আপনি করে বলে। তাকে কেন রিকশাওয়ালা গালি দেবে? মীরা অবশ্যি কিছুই বলল না। সারা বিকাল ফুঁপাল।

নাশতার টেবিলে মা বললেন, তোর মেজো খালু মারা গেছেন, শুনেছি? আমি নিস্পৃহ গলায় বললাম, হুঁ।

দুঃখিত, ব্যথিত হবার ভঙ্গিমার সামনে করলাম না। এক বিষয় নিয়ে দুবার অভিনয় করার কোন মানে হয় না।

মা বললেন, রাত তিনটার সময় মারা গেলেন। ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে বললেন, ফরিদা, একগ্লাস পানি দাও। ফরিদা পানি এনে দিল। পানি খেয়ে বললেন, মেয়েটাকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। ফরিদা বলল, মেয়েকে ডাকার দরকার কি? তোর মেজো খালু বললেন, শরীরটা ভালো লাগছে না। তখন তাঁর খুব ঘাম হতে লাগল। তারপর....

মা নিপুণ ভঙ্গিতে মৃত্যু-সময়কার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো বলতে লাগলেন। এতসব খুঁটিনাটি তিনি কোত্থেকে জোগাড় করলেন কে জানে। আমি লক্ষ করেছি, মৃত্যু বিষয়ক খুঁটিনাটি মেয়েরা খুব আগ্রহ করে বলে।

তোর খালুর ঘাম দেখে ফরিদা বলল, এত ঘামছ কেন? গরম লাগছে? তোর খালু বললেন, একটা ভেজা ভোয়ালে দাও.....

আমি মাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এত খবর পেলে কোথায়?

মার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। তাঁকে কোনো প্রশ্ন করলেই তিনি মনে করেন তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। তখন অসম্ভব রেগে যান। এই ভোরবেলাতেই মাকে রাগিয়ে

দেবার কোনো মানে হয় না। আমি আগের প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে বললাম, বেচারা অল্পবয়সে মারা গেল। তুমি যাচ্ছ ও বাড়িতে?

মা আঁৎকে উঠে বললেন, সংসার ফেলে আমি যাব কী করে—তোর ছোট চাচীর আবার ব্যথা উঠেছে।

তাই নাকি?

সারারাতই তো ব্যথায় ছটফট করল। খবর রাখিস না নাকি? হাসপাতালে নিতে হবে মনে হয়। তোর ছোট চাচা বলছিল দুপুর নাগাদ ব্যথা না কমলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

আমি শুকনা গলায় বললাম—ও।

ছোট চাচীর ব্যথা হচ্ছে নিত্যদিনকার একটা ব্যাপার। এই খবরে শুকনো ও ছাড়া কিছু বলা যায় না। ছোট চাচীর ব্যথা এবং ব্যথার সঙ্গে জড়িত কুঁ কাতরধ্বনির সঙ্গে আমরা এত পরিচিত যে, এখন এসব শুনলে মুখের ভাবভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয় না। তবে ছোট চাচীর ব্যথা আমাদের নানান সময়ে নানান উপকার করে। এই যেমন আজ করছে। মা বলতে পারছেন—ছোট চাচীর ব্যথার কারণে তিনি যেতে পারছেন না। যে সমস্ত বিয়ের দাওয়াতে আমাদের যেতে ইচ্ছে করে না আমরা খবর পাঠাইছোট চাচীকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। কী যে অবস্থা।

সংসারে এক জন সিরিয়াস ধরনের রোগী থাকার অনেক সুবিধা। খুব কাজে লাগে। অবশ্যি ছোট চাচীর ব্যথার সমস্যা না থাকলেও যে মা মেজো খালার বাসায় যেতেন তা মনে হয়

না। ফরিদা খালা মার আপন বোন না। খালাতো বোন। যাকে মা খুবই অপছন্দ করেন। শুধু মা একা না, এই মহিলাকে কেউ দেখতে পারে না। সুন্দরী এক জন মহিলা, যে খুব চমৎকার করে কথা বলে, তাকে কেন সবাই এত অপছন্দ করে কে জানে। আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ই মনে হয়। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা ভালো। বেশ আদুরে ভঙ্গি আছে। বাসায় গেলে প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন। তবু কেউ তাঁকে দেখতে পারে না।

আসলে অপছন্দ করা উচিত মেজো খালুকে। ভদ্রলোক দেখতে কোলা ব্যাঙের মত। মুখের হাঁ-টা অনেক বড় বলে যখনই সেন তখনই আলজিত দেখা যায়। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের ভুড়ি লাফালাফি করে। কুৎসিত দৃশ্য। স্বভাবটাও কুৎসিত। অসম্ভব কৃপণ। আটচল্লিশ বছর বয়সেই বাড়ি-গাড়ি করে হুলস্থূল করেছেন, অথচ হাত দিয়ে একটা পয়সা বের হয় না। আমার বড় বোন ইরার বিয়েতে এসেছিলেন। খালি হাতে। অবশ্যি এসেই বললেন, জামাইয়ের জন্যে একটা স্যুটের কাপড় কিনে রেখেছি। জামাইকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, দরজির কাছে মাপ দিয়ে আসবে। শুধু শুধু স্যুটের কাপড় দেয়ার কোন অর্থ হয় না। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি, কাপড়ের চেয়ে দরজির খরচ বেশি।

ইরার স্বামী-বেচারা এখনো সেই স্যুট পরতে পারে নি। নতুন জামাই তো আর ঐ বাড়িতে গিয়ে বলতে পারে না-খালুজান, স্যুটের মাপ দিতে এসেছি।

আমার ধারণা, মেজো খাল স্যটের কাপড়ের কথা বলে প্রচুর বিয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন। বেঁচে থাকলে হয়ত আরো খেতেন।

না। এক জন মৃত মানুষ সম্বন্ধে এইসব ভাবা উচিত না। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই অনেক ভালো গুণ ছিল, আমরা যার খবর রাখি না। এক জন মৃত মানুষ সম্পর্কে ভালো ভালো কথা ভাবা দরকার। চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে অনেক চেষ্টা করলাম ভদ্রলোক সম্পর্কে ভালো কিছু মনে করতে। মনে পড়ল না।

চা শেষ করে উঠতে যাব, মা বললেন, সময় করে একবার ও বাড়িতে যাস তো। কেউ না গেলে খারাপ দেখায়।

আমি বললাম, আচ্ছা। আমাদের বাড়ির সিনিয়র মানুষদের কোনো কথাতেই আমি না বলি না। এতে সবার ধারণা হয়েছে যে, আমি এক জন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্রছেলে, তবে কিঞ্চিৎ বোকা। বোকা না হলে কেউ কি আর সব কথাতেই হ্যাঁ বলে? অবশ্যি এম্নিতেও আমি আমার বুদ্ধিমত্তার তেমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারি না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বি.এ পাস করে বর্তমানে নাইট সেকশনে ল পড়ছি। কেন পড়ছি নিজেও জানি না। ল পাস করে কোর্টে গিয়ে ফাটাফাটি করব এই জাতীয় দিবাস্বপ্ন আমার নেই। পড়তে হয় বলে পড়া। শুনেছি লতে ভর্তি হয়ে থাকলে দুতিন বছর পর আপনা-আপনি ডিগ্রি হয়ে যায়। সেই ভরসাতেই আছি। বাড়ির অন্যদেরও আমার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ নেই। আমার সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব হচ্ছেকরুক যা ইচ্ছা, কোনো ঝামেলা তো করছে না। বেচারা আছে নিজের মতো।

আমাদের বাড়ির লোকজনদের কিছু পরিচয় দেয়া মনে হয় দরকার। এ বাড়ির সবচে সিনিয়র এবং সবচে নির্বোধ ব্যক্তি হচ্ছেন আমার বড় চাচা। বয়স তেষট্টি। দৈত্যের মতো শরীর। যাকে বলে বৃষ-স্কন্ধ। এখনো নিয়ম ধরে একসারসাইজ করেন। ভোরবেলা ছোলা

এবং মধু খান। রাতে ঘুমুবার আগে যোগব্যায়াম করেন। তাঁর তিন মেয়ে। তিন জনই থাকে আমেরিকায়। বিয়ে করে বাড়ি-টাড়ি বানিয়ে সুখে আছে বলা যেতে পারে। বড় চাচী গ্রিনকার্ড না কী যেন পেয়েছেন। বছরের বেশিরভাগ সময় মেয়েদের সঙ্গে থাকেন। মাঝে মাঝে দেশে আসেন।

বড় চাচা ফিলসফিতে এম.এ। অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। ফিলসফি বিষয়টাতেই সম্ভবত কোনো গণ্ডগোল আছে। এই বিষয় নিয়ে বেশিদিন পড়াশোনা করলেই লোকজন খানিকটা নির্বোধ হয়ে যায় বলে আমার ধারণা। বড় চাচা যেমন হয়েছেন। তবে নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি উচ্চ। ভালো খাওয়াদাওয়া তাঁর খুবই পছন্দ। যদিও গত দুমাস ধরে নিরামিষ খাচ্ছেন। কোথায় নাকি পড়েছেন, নিরামিষ খেলে শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। এখন সেই চেষ্টা করছেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, শরীরে ইলেকট্রিসিটি হলে লাভ কী? বড় চাচা তার উত্তরে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যার অর্থ–এই গাধা বলে কী!

শরীরে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা ছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানেও তিনি। বেশকিছু সময় ব্যয় করেন।

তিন ভাইয়ের দুনম্বর হচ্ছেন আমার বাবা। রোগা-পটকা বেঁটেখাটো এক জন মানুষ। অসুখ-বিসুখ তাঁর লেগেই আছে। সম্প্রতি রাতে চোখে কম দেখছেন। বড় চাচার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোেট। যদিও তাঁকে বড় চাচার চেয়ে অনেক বয়স্ক মনে হয়। ব্যাংকে মাঝারি ধরনের এক জন অফিসার কথাবার্তা একবারেই বলেন না। বাড়িতে যে সময়টা থাকেন তার সবটাই কাটান খবরের কাগজ পড়ে। বাড়িতে দুটো খবরের কাগজ রাখা হয়।

আমার ধারণা, এই দুটো খবরের কাগজের প্রতিটি ছাপা শব্দ তিনি তিন চারবার করে পড়েন। আমার বাবা সম্পর্কে অতি সম্প্রতি আমি একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি। পরে তা বলা যাবে।

এ বাড়ির সবচে সুপুরুষ, সবচে স্মার্ট এবং সবচে সাকসেসফুল মানুষ হচ্ছেন আমার ছোট চাচা। চোখের ডাক্তার। ভিয়েনা থেকে আই সার্জারিতে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। এসেই দুহাতে পয়সা কামাচ্ছেন। চোখ উঠা রোগ ছাড়াও যে বাংলাদেশে চোখের এত রোগ আছে আমার জানা ছিল না। আমাদের এই তিনতলা বাড়ির পুরোটাই ছোট চাচার টাকায় করা। একতলায় তিনটা ঘর নিয়ে তাঁর চেম্বার। রোগী দেখেন যে ঘরে, সে ঘরে এয়ারকুলার লাগান। ডিসটেম্পার করা নীল দেয়ালের ঠাণ্ডা ঘর। পর্দার রঙ নীল। দেয়ালে দুটি ছবি আছে। দুটির বিষয়বস্তুও নীল। একটায় নীল সমুদ্র, একটায়। নীল আকাশ। এই প্রসঙ্গে ছোট চাচার বক্তব্য হচ্ছে—আমার এখন পিকাসোর মতো রু পিরিয়ড চলছে।

ছোট চাচার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হল। মেয়েটির নাম নিনি। যে সব মেয়ের নিনি জাতীয় নাম হয় তারা সাধারণত খুব হাইফাই ধরনের হয়ে থাকে। ছোট চাচীও তাই। পুতুলের মতো সুন্দর একটা মেয়ে, যাঁর ঠোঁট দুটো লিপিষ্টিক ছাড়া লাল টুকটুকে। বিয়ের ছমাসের মধ্যেই ছোট চাচী কী রোগ বাধালেন কে জানে দিনরাত কু কুঁ। শরীরে তীব্র ব্যথা। সেই ব্যথাও বেশ অদ্ভুত ধরনের, হেঁটে চলে বেড়ায়। কখনো ব্যথাটা হাতে, কখনো পায়ে, কখনো পেটে। আমি এমন অদ্ভুত অসুখ কখনো দেখিনি, কারো হয়েছে বলেও শুনি নি। সব রকম চিকিৎসা হয়েছে, এখন চলছে দ্বৈব চিকিৎসা। ছাগলের মতো দাড়িওয়ালা এক লোক বেতের টুপি মাথায় দিয়ে প্রতি মঙ্গলবার আসছে। ছোট চাচীর ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কী সব ঝাড়ফুক নাকি করছে। আলোচনা শুনতে পাচ্ছি চাচীকে আজমীর শরীফে

নিয়ে যাওয়া হবে। মনে হচ্ছে, চিকিৎসাশাস্ত্র পুরোপুরি ফেল করেছে। তবে খুব লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই প্রচণ্ড অসুখবিসুখে তাঁর চেহারা বা স্বাস্থ্যের কোনো এদিক-ওদিক হচ্ছে না। আগে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন। বরং ঠোঁট এবং গাল দুই-ই আরো বেশি লালচে হয়েছে।

নাশতা শেষ করে সিগারেট হাতে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দা হল আমার মোকিং কর্নার। বারান্দা এবং ছাদ। বেশিরভাগ লোকই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা বসে সিগারেট টানতে ভালবাসে, আমার ভালো লাগে হেঁটে হেঁটে টানতে। সিগারেট অবশ্যি ধরানো গেল না। জ্বলন্ত সিগারেট চট করে লুকিয়ে ফেলতে হল। কারণ বাইরের বারান্দায় ছোট চাচা বিরক্তমুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে নার্সের পোশাক পরা মিস নমিতা (কিংবা মিস সমিতা, এই মুহূর্তে নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।) এই নার্সটির বয়স খুবই অল্প। চেহারা ভালো না। গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তবু ধবধবে সাদা নার্সের পোশাকে মেয়েটিকে চমৎকার লাগে। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। মিস নমিতা (অথবা সমিতা) এই বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন। ছোট চাচীর খুব বাড়াবাড়ি হলে তাঁকে আনা হয়। কাল রাতে নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে বলেই তাঁকে আনা হয়েছে। নিশ্চয়ই রাত জেগেছে। ঘন ঘন হাই তুলছে। জগতের কুৎসিততম দৃশ্যের একটি হচ্ছে মেয়েদের হাই ভোলা, তবে এই মেয়েটিকে হাই তোলা অবস্থাতে তেমন খারাপ দেখাচ্ছে না।

ছোট চাচা আমাকে দেখেই বললেন, যাচ্ছিস কোথায়?

আমি বললাম, মেজো খালুর বাসায়। বেচারা মারা গেছেন। শুনেছেন বোধহয়।

হুঁ, শুনেছি। আনফরচুনেট ডেথ। আমার একবার যাওয়া উচিত। দেখি বিকেলের দিকে যদি সময় পাই। বিকেলে আবার একটা মিটিং পড়ে গেল।

ছোট চাচা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে কথা বলছেন। আমার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার তো কোন দরকার নেই, তবু দিচ্ছেন কেন কে জানে। তিনি অকারণে খানিকক্ষণ খুক খুকও করলেন। নার্ভাস হলে তিনি এটা করেন। যে কোনো কারণেই হোক তিনি আজ খানিকটা নার্ভাস। আমি বললাম, যাই চাচা। তিনি বললেন, আয়, তোক খানিকটা এগিয়ে দেই। মগবাজার চৌরাস্তা পর্যন্ত। ওখান থেকে রিকশা নিয়ে যাবি।

গাড়িতে আমরা চার জন উঠলাম। ছোট চাচা ড্রাইভিং সিটে, আমি তাঁর পাশে। পেছনের সিটে সমিতা এবং ড্রাইভার কুদুস মিয়া। ড্রাইভার কুদ্দুস মিয়া এ বাড়িতে খুব সুখের চাকরি করছে। পুরো বেতন নিচ্ছে অথচ গাড়ি চালাতে হচ্ছে না। গাড়ি সব সময় ছোট চাচাই চালান। সে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে পেছনের সিটে বসে বসে ঝিমায়।

গাড়ি বড় রাস্তায় পড়ামাত্র ছোট চাচা বললেন, সমিতা, তুমি কোথায় নামবে?

মেয়েটার নাম তাহলে সমিতা। নমিতা নয়। সমিতা মানে কী? কে জানে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সমিতা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। কেন জবাব দিল না কে জানো প্রশ্ন শুনতে না পেলে ভিন্ন কথা, কিন্তু যদি শুনে থাকে তাহলে জবাব দেবে না কেন? রহস্যটা কী? শাহবাগের মোড়ে এসে ছোট চাচা গাড়ি থামিয়ে বললেন, কুদ্দস, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও তো।

কুদ্দুস নেমে গেল।

কদ্দসের সঙ্গে নামল সমিতা। শীতল গলায় বলল, আমি এইখানে নামব। বলেই গট গট করে চলে গেল। সালাম দিল না বা বলল না, স্যার যাই। এর মানেটা কী? কুদ্দুস সিগারেট কিনেছে কিন্তু ভাংতি দিতে পারছে না। তার হাতে পাঁচ শ টাকার একটা নোট। নোটটা নিয়ে এ-দোকান ও-দোকান করছে।

ছোট চাচা বললেন, টুকু, একটা সমস্যা হয়েছে। তোকে বলা দরকার।

আমি বললাম, কী সমস্যা?

তিনি বেশ সহজ গলায় বললেন, এই সমিতা মেয়েটাকে আমি বিয়ে করব বলে ভাবছি।

আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, কবে?

সেটা এখনো ফাইনাল করি নি। কবে বিয়ে করব সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। বিয়ে করব সেটাই ইম্পর্টেন্ট।

বলেই ছোট চাচা গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কারণ কুদ্দুস টাকার ভাংতি পেয়েছে। সে সিগারেট নিয়ে ফিরছে। আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, বাড়ির কেউ জানে?

না। আমি বলব সবাইকে। লুকিয়ে রাখার মতো তো কিছু না।

ছোট চাচার গাড়ি উড়ে চলল। তিনি আস্তে গাড়ি চালাতে পারেন না। গাড়ি হু হু করে ছুটছে। আমি বসে বসে ঘামছি। কী সর্বনাশের কথা।

মেজো খালুরা একটি দুতলা বাড়ির একতলায় থাকেন। বাড়ির নাম নীল কুঠির। অবশ্যি কুটির বানানটা ভুল করে লেখা কুঠীর। ভুল নামের বাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় এই বাড়িতে ঝামেলা আছে।

নীল কুঠির মেজো খালুর নিজের বাড়ি নয়। ভাড়া বাড়ি। উত্তর শাহজাহানপুরে তিনি চমৎকার একতলা একটা বাড়ি বানিয়েছেন। এ মাসের শেষ শুক্রবারে তাঁদের নিজ বাড়িতে উঠার কথা ছিল। মেজো খালু সে সুযোগ পেলেন না। তাঁদের বাড়ির সবাই দীর্ঘদিন এই নিয়ে বলাবলি করবে। মেজো খালুর প্রসঙ্গ উঠলেই বলবে, আহা, বেচারা নিজের বাড়িতে একরাত কাটাতে পারল না। কী ক্ষতি হতত কয়েকটা দিন পরে মারা গেলো যেন আর কটা দিন পরে মারা গেলে এই মৃত্যু সহনীয় হত।

আমি লক্ষ করেছি সব মৃত মানুষকে নিয়ে একটানা-একটা অতৃপ্তির গল্প চালু থাকে। কেউ হয়তো মৃত্যুর আগের দিন বলেছিল, মা। খুব ঝাল দিয়ে পাবদা মাছ রাধ তো। খেতে ইচ্ছা করছে। মা রাঁধেন নি। এই দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। আজ তিনি শুধু পাবদা মাছ না, কোনো মাছই খেতে পারেন না।

মৃত লোকের চেয়ে তার অতৃপ্তির ব্যাপারটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। মৃত মানুষটির কথা কেউ বলে না। তার অপূর্ণ সাধের গল্প করে। আচ্ছা, এমন কেউ কি আছে মৃত্যু। মুহূর্তে যার

কোনো অপূর্ণ সাধ ছিল না? যে যাত্রা শুরু করে একজন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত এবং সুখি মানুষ হিসেবে?

আমি দাঁড়িয়ে আছি নীল কুঠিরের গেটের বাইরে। আমার মনে উচ্চ শ্রেণীর সব ভাব আসছে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। সকালের সিগারেটটি খাওয়া হয় নি। সিগারেট ধরাবার একটা চমৎকার জায়গা। সিগারেট ধরালাম। এবং সুখ কী এই নিয়ে চিন্তা শুরু করলাম। এইসব চিন্তা-ভাবনার বুদ্ধি বড় চাচার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি আমাদের আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে এ জাতীয় ট্রেনিং ছেলেবেলায় দিয়েছেন—বুঝলি, যখন কিছু করার থাকবে না তখন চিন্তা শুরু করবি। ধর, সুন্দর একটা গাছ দেখলি, তখন কী করবি? নিজেকে প্রশ্ন করবি-গাছটা সুন্দর লাগছে কেন? সৌন্দর্য ব্যাপারটা কী?

বড় চাচার ট্রেনিঙে আমাদের আত্মার শক্তির কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে কি-না আমি জানি না তবে খানিকটা ভ্যাবার মতো যে হয়েছি তাতে সন্দেহ নেই।

কে, টুকু না?

ফিলসফিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সরাসরি ধুলা-কাদার পৃথিবীতে চলে এলাম। প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি মেজো খালুর বড় ভাই। পর্যটনের বড় অফিসার। পর্যটনের অফিসাররা সব সময় খানিকটা সেজেগুজে থাকেন। তাঁদের দেখলেই মনে হয় এই বুঝি বেড়াতে যাচ্ছে। হয় পিকনিকে, নয় বিয়েবাড়িতে। এই ভদ্রলোক নিজের ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েও লাল টকটকে একটা টাই পরে এসেছেন। জুতা যেমন চকচক করছে, তাতে মনে হয় বুট পালিশওয়ালাকে দিয়ে পালিশ করানো। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে যা। এঁর সঙ্গে আমার এমন কোনো ঘনিষ্ঠতা

নেই যে তিনি আমাকে তুই তুই করে বলবেন। আমি লক্ষ করেছি, আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন (নিকট কি দূরের) আমাকে তুই তুই করে বলেন এবং দেখা হওয়ামাত্র কোন একটা ফরমায়েস দিয়ে বসেন। সম্ভবত আমার চেহারায় চাকর চাকর একটা ভাব আছে।

মেজো খালুর বড় ভাই পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সরু চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, তিনি এখন বলবেন—চট করে এক প্যাকেট বেনসন নিয়ে আয় তো দেখবি যেন ড্যাম্প না হয়। সত্যি সত্যি ভদ্রলোক একটা এক শ টাকার নোট বের করে ইতস্তত করতে লাগলেন। আমি বললাম, কিছু আনতে হবে?

তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, তিন কেজি চিনি নিয়ে আয় তো। ঘরে এক দানা চিনি নেই, এদিকে লোকজন যারা আসছে, তাদের এটলিস্ট এককাপ চা তো অফার করা দরকার। এর নাম সামাজিকতা। মরেও রক্ষা নেই, সামাজিকতা চালিয়ে যেতে হবে। হোয়াট এ সোসাইটি।

তিন কেজি চিনি কিনলাম। পঁয়ত্রিশ টাকা করে তিন কেজির দাম নিল এক শ পাঁচ টাকা। আমি দোকানদারকে বললাম, আমার কাছে এক শ টাকাই আছে। আপনি কি পাঁচটা টাকা কম রাখতে পারেন?

দোকানদার বলল, একদাম। এমনভাবে বলল যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পাঁচ টাকা কমানোর প্রস্তাবে সে খুবই অপমানিত বোধ করছে। আমি বললাম, আপনি এক কাজ করুন, এখান থেকে পাঁচ টাকার চিনি কমিয়ে ফেলুন। দুই খাবলা চিনি নিয়ে নিন। দোকানদার মনে হল এতে আরো অপমানিত বোধ করল। এক ধরনের মানুষই আছে যারা কথায় কথায় অপমানিত বোধ করে। এদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—ভাই কেমন

আছেন? এরা অপমানে নীল হয়ে যায়। মনে করে, তাদের দারুণ অপমান করা হল। এই দোকানদার বোধহয় সেই পদের। সে চিনি কমাল না। প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে মুখঝামটার মতো একটা ব্যাপার করল। যেন তার পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে গেছে। আমি মনে মনে হারামজাদা বলে বের হয়ে এলাম।

মা-বাড়ির দৃশ্য সচরাচর যা হয়, এ বাড়িতেও তাই। মেজো খালা কাত হয়ে একটা ইজিচেয়ারে পড়ে আছেন। তাঁর মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু একজন কে যেন প্রবল বেগে তালপাতার পাখায় তাকে বাতাস করছে। খালার মাথার সমস্ত চুল ভেজা। মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই মাথা ধুইয়ে দেয়া হয়েছে। পরিচিত যে-ই আসছে, খালা খানিকক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন এবং বলছেন, আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমরা আমাকে বিষ এনে দাও। আমি সহ্য করতে পারছি না।

আমার চট করে মনে হল খালাকে খানিকটা বিষ সত্যি সত্যি যদি এখন দেয়া হয় এবং বলা হয়—এই যে বিষ এনেছি, নিন। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? খালা এই মুহূর্তে প্রবল শোকের যে ছবি দেখাচ্ছেন তার কতটা খাঁটি? আমি নিশ্চিত, মাসখানিকের মধ্যে তিনি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন। ভিসিআর-এ ছবি দেখবেন। দুপুরে ঘুবেন। তরকারিতে লবণ কম হলে কাজের মেয়েটিকে বকাঝকা করবেন।

আমি তিন কেজি চিনির প্যাকেট নিয়ে খানিকটা দিশাহারার মত হয়ে গেলাম। কাকে দেব? বাড়ি গিজ গিজ করছে মানুষে। সবাই কথা বলছে। মেয়ে মহলের তিনভাগের একভাগ শব্দ করে কাঁদছে। কয়েকজন মৌলানাকে আনা হয়েছে, যারা অতি দ্রুত কোরান খতম

দিচ্ছেন। থার্টি থ্রি আরপিএম-এর রেকর্ড ফোর্টি ফাইভে দেয়া। হয়েছে। এই বিরাট ঝামেলায় তিন কেজির প্যাকেট দেব কাকে?

খালুর বড় ভাইকে পাওয়া গেল। তিনি লাল টাই খুলে ফেলেছেন। তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখাচ্ছে। সামান্য একটা টাই যে মানুষকে এতটা বদলে দিতে পারে, আমার জানা ছিল না। লাল রঙের কাপড়ের টুকরাটার উপর আমার ভক্তি হল।

চিনি এনেছ টুকু?

জ্বি।

গুড। মেনি থেংকস। ফেরত এসেছে কত?

ফেরত আসে নি। পঁয়ত্রিশ টাকা করে কেজি।

কি বলছ তুমি। ত্রিশ টাকা কেজি সব জায়গায়। দশ টাকা ফেরত আসার কথা!

ভদ্রলোক বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যে দৃষ্টির অর্থ হচ্ছে–দশটা টাকা তুমি ম্যানেজ করে নিলে এটা তো তোমার কাছ থেকে আশা করি নি।

তিনি বিরস মুখে বললেন, টেবিলের উপর রেখে দাও। আমি টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখলাম। ছোট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় মেজো খালাকে আনা হয়েছে। মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মেজো খালার অজ্ঞান হওয়া তেমন কোনো বিশেষ ব্যাপার না। অতি সামান্য ব্যাপারেই তিনি অজ্ঞান হন।

আমাদের বাসায় এসে একবার তিনি গরমে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর তাঁর জ্ঞান হল এবং তিনি বললেন, এয়ারকন্ডিশন ঘরে থেকে থেকে শরীরের সিস্টেমটাই নষ্ট হয়েছে। ঐ দিন গাউছিয়ায় গিয়েছিলাম, গরমে আর ভিড়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। এক শাড়ির দোকানে নিয়ে শোয়াল। বিশ্রী কাণ্ডআমার হোট বোন মীরার ধারণা, মেজো খালার অজ্ঞানের ব্যাপারটা চমৎকার একটা অভিনয়-কলা। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এই অভিনয় তিনি প্রায় জায়গাতেই করেন এবং বেশ ভালোই করেন। এখানেও তাই বোধহয় হচ্ছে। মেজো খালার মাথায় পানি ঢালছে তাঁদের একমাত্র মেয়ে রিমি। রিমি তার মায়ের মতো রূপবতী হয় নি। খুবই সাদামাঠা ধরনের চেহারা, তবে এই মেয়েকে দেখলেই মনে একটা স্নিগ্ধ ভাব হয়। মনে হয় সে এইমাত্র স্নান সেরে এসেছে। তার গলার স্বরও বেশ অদ্ভুত। যখন কথা বলে তখন মনে হয় অনেক দূর থেকে কথা বলছে। খুব কাছাকাছি থাকলেও তার গলার স্বরের জন্যে তাকে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়। রিমি আমার সমবয়েসী। বয়সে আমার তিন মাসের বড়। সে ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ার অনার্স ফাইনাল দেবে। যদিও তার থাকার কথা এম. এ ক্লাসে। সেশন জট সব গুবলেট করে ফেলেছে। মেজো খালা চোখ খুললেন। রিমি পানি ঢালা বন্ধ করে উঠে এল। আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, টুকু, আমার সঙ্গে একটু আয় তো।

রিমির সঙ্গে আমার সম্পর্কে খানিকটা জটিলতা আছে। এই জটিলতার ব্যাপারটা পরে বলব।

রিমি আমাকে তার ঘরে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকিয়েই দরজা ভিড়িয়ে দিল। এটা সে সব সময় করে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হয় দরজা ভিড়িয়ে দেয়, নয় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। মেজো খালা এই ব্যাপারটা সঙ্গত কারণেই খুব অপছন্দ করেন। মেয়ের

সঙ্গে এই নিয়ে তার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। খালা অপছন্দ করেন বলেই রিমি এই কাজটা বেশি বেশি করে।

টুকু, চেয়ার টেনে বস।

আমি বসলাম। রিমি বলল, অসম্ভব কান্না পাচ্ছে। আমি এখন চিৎকার করে কাঁদব। তুই চুপচাপ বসে থাকবি।

আমি কিছু বললাম না। বসে রইলাম। রিমিকে দেখলে মনে হয় সে খুব গোছালো ধরনের মেয়ে। আসলে তা নয়। তার ঘর সব সময়ই এলোমেলো। রিমি কাঁদল না। আমি জানতাম সে কাঁদবে না। আমি এখন কাঁদব বলার পর কেউ কাঁদতে পারে না।

টুকু।

কি।

মার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য যে কোনো একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে বাবা আরো অনেক দিন বাচত।

এখন এসব কথা থাক।

আমি এই কথা শুধু আজই বলব, আর কোনোদিন বলব না। আর বলব শুধু তোকে, আর কাউকে না।

আমাকে বলার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

কথা বলিস না। তুই শুধু শোনে যা। হা হু কিছু করতে হবে না। শুধু শুনে যাবি আমার মা, বাবার জীবনটা একেবারে ভাজা ভাজা করে ফেলেছে। আমি যখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখনকার একটা ঘটনা বললেই তুই সবটা বুঝতে পারবি।

আমার বুঝে দরকারটা কি?

কেন শুধু কথা বলছিস? শুনতে অসুবিধা কি? আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, মরিয়ম নামের অল্পবয়েসী একটা কাজের মেয়ে ছিল। মেয়েটা দেখতে বেশ ভালো। একদিন রাতে আমরা সবাই খেতে বসেছি, বাবা বললেন, মরিয়ম, ফ্রিজ থেকে খুব ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি দাও তো।

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সব কাজের লোককে তুমি তুই তুই করে বল; মরিয়মকে তুমি করে বলছ কেন?

বাবা বিব্রত সুরে কী যেন বললেন। মা কঠিন গলায় বললেন, ওর সঙ্গে এত কী তোমার খাতির?

খাতিরের কী দেখলে?

ঐ দিন দেয়াশলাইয়ের খোঁজে তুমি রান্নাঘরে গেলে। দেয়াশলাইয়ের জন্যে কেন? দেয়াশলাই আনতে বললে কি ওরা এনে দিত না?

মেয়ের সামনে কী সব পাগলামি শুরু করলে?

সত্যি কথা বললে পাগলামি হয়ে যায়? তুমি আমাকে কী ভাব? আমি চোখেও দেখি না, কানেও শুনি না? তোমার ফষ্টিনষ্টি, ছোঁক ছোঁক আমি বুঝি না? আমি এখনও ফিডার দিয়ে দুধ খাই?

বাবা খাওয়া রেখে উঠে চলে গেল। ঘটনা এখানেও শেষ হল না। মা মরিয়মকে ডেকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বাবা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। মা মরিয়মকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে বললেন, এইবার মনের সাধ মিটিয়ে ফষ্টিনষ্টি কর। এই বলেই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটা ঘটল আমার চোখের সামনে।

রিমি কাঁদতে শুরু করল। সে চিৎকার করে কাঁদবে বলেছিল। সত্যি সত্যি সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

সে কাঁদবে না—আমার এই ধারণা ঠিক হল না। যতটুকু অবাক হবার দরকার আমি তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম। আমার নিজের ধারণার বাইরে যখন কিছু ঘটে, তখন খুব অবাক হই। কারণ সচরাচর তেমন ঘটে না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটি মেয়ে কাঁদছে—এই দৃশ্য চুপচাপ দেখা যায় না। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মাথায় হাত দিতেই সে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন স্টুপিড? মেয়েদের গায়ে হাত দিতে ভাল লাগে?

খালার বাড়িতে অল্পকিছু সময় থাকব বলে এসেছিলাম। থাকতে হল রাত দশটা পর্যন্ত। মরা-বাড়ির শতেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল। ট্রাক আনা, গোরস্থানে খোঁজখবর করা।

এর মধ্যে একবার মেজো খালুর বড় ভাই আবার একটা এক শ টাকার নোট দিয়ে বললেন, টুকু, চট করে এক প্যাকেট বিদেশি ফাইভ ফাইভ নিয়ে আয় তো।

আমি উদাস গলায় বললাম, আমাকে দোকানদাররা খুব ঠকায়, পাঁচ দশ টাকা। বেশি নেবে, অন্য কাউকে দিয়ে আনালে হয় না?

আর কাউকে দেখছি না। তুই কাইন্ডলি যা।

আমি চকচকে এক শ টাকার নোটটা নিয়ে বের হয়ে এলাম। মনে হল আর ফিরে না গেলে কেমন হয়? ব্যাটাকে সামান্য শিক্ষা দেয়া। সে অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হবে। টাকা যাওয়ার শোকে পাথর হয়ে যাবে। হোক। অবশ্যি আমার কপালে চোর অপবাদ জুটবে। জুটুক। কী আর করা। বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এতক্ষণ যখন ছিলাম, মৃত মানুষটাকে কবরে শোয়ানো পর্যন্ত থেকে যাই। আমি সিগারেটের বদলে তিন কেজি চিনি কিনে ফেললাম।

কই, সিগারেট এনেছ? দাও।

আমি বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম, সিগারেট আনতে বলেছিলেন না কি? মাই গড। আমি তো আবার তিন কেজি চিনি নিয়ে এসেছি।

মেজো খালুর সাজুগুজু করা ভাই হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, রাগে তাঁর পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে।

আমি বদলে নিয়ে আসছি। আপনি চিন্তা করবেনো। ঐ দোকানেসিগারেটও আছে। ইন দি মিন টাইম আপনার যদি খুব সিগারেটের তৃষ্ণা হয় আমার কাছ থেকে একটা নিয়ে খেতে পারেন।

তুমি বদলে নিয়ে এস।

জ্বি আচ্ছা।

আমি ঠিক করে ফেললাম আধঘণ্টার মতো হাঁটাহাঁটি করে ফিরে যাব। খুব ভালোমানুষের মতো গলায় বলব, ফেরত নিল না। অনেক চেষ্টা করেছি। সোসাইটিটা নষ্ট হয়ে গেছে। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

২. সেলুনে চুল কাটাতে

সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে দেখি এক জন সন্ন্যাসী বসে আছেন। সোফায় পা তুলে পদ্মসন হয়ে বসে থাকা জলজ্যান্ত সন্ন্যাসী। বাংলাদেশে এই জিনিস দেখাই যায় না। যে দু একটা দেখা যায় তাও স্কুলের এ্যানুয়েল স্পোর্টসে যেমন খুশি সাজো অংশে। কিন্তু যে সন্ন্যাসী বসে আছেন তাঁর মধ্যে সাজের কোনো ব্যাপার নেই, খাঁটি সন্ন্যাসী। চুলে জট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া কাপড়। সোফায় হেলান দেয়া বিচিত্র এক লাঠি। সন্ন্যাসী আমাকে বললেন, ভাইয়া, আপনার কাছে দেয়াশলাই আছে?

সন্ন্যাসীর মুখে ভাইয়া ডাক মানায় না। ওহে বৎস-টৎস বললে হয়ত মানাতো। আমি তাঁকে দেয়াশলাই দিলাম। ভেবেছিলাম তিনি সিগারেট ধরবেন, তা না করে তিনি দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে গভীর মনোযোগ কান চুলকাতে লাগলেন। কান চুলকানোর মতো শারীরিক সুখের প্রতি সন্ন্যাসীদের মোহ থাকে জানতাম না। আমি বেশ কৌতূহল নিয়েই তাকিয়ে রইলাম।

এর আগমন কী জন্যে হয়েছে কে জানে। সম্ভবত চাচীর অসুখ সারানোর জন্যে। সব কিছুই তো হল, সন্ন্যাসীই বা বাদ থাকে কেন?

আমি বললাম, আপনি এখানে, কি ব্যাপার? সন্ন্যাসী জবাব দিলেন না। ব্যাপার কি জানার জন্যে বাড়ির ভেতর চলে গেলাম।

আমাদের বসার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ছোট ঘরটায় আমার হোট দুবোন মীরা এবংনীরা পড়ে। দুজনেরই সামনে পরীক্ষা। এই সময় এদের বই চোখের সামনে নিয়ে বসে থাকার কথা। আজ কেউ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, শুধু এরাই যে নেই তাই না, পুরো একতলায় কোনো মানুষজন নেই। লক্ষণ মোটই সুবিধার নয়। মনে হচ্ছে ছোট চাচীর কিছু একটা হয়ে গেছে। কিংবা হতে যাচ্ছে। সবাই ভিড় করেছে দোতলায়। ফলস্ এ্যালার্ম কি কে জানে। ইদানীং মাসের মধ্যে দু একবার ছোট চাচী ফলস্ এ্যালার্ম দিচ্ছেন। মরি মরি করেও মরছেন না।

আমি ভেতরের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না। দোতলায় যাব? না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আমার ঘর তিনতলার ছাদে। চুপি চুপি নিজের ঘরে চলে যাওয়া যায়। তবে তারও সমস্যা আছে। ভাত খাওয়ার জন্যে আবার একতলায় নেমে আসতে হবে। এই বাড়ির রান্না এবং খাবার ঘর একতলায়, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জন্যে তিনতলা এবং দোতলায় খাবার যায়, যেমন বড় চাচা তিনতলায় থাকেন, তাঁর জন্যে খাবার যায়। ছোট চাচা থাকেন দোতলায়, তাঁর জন্যেও যায়, তবে সব দিন না। বেশিরভাগ সময়ই তিনি নিচে খেতে আসেন।

বারান্দা থেকে আমি খাবার ঘরে ঢুকলাম। উপরে উঠার সিঁড়ি এই ঘরেই। বাইরে দিয়েও একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির মুখের কলাপসেবল গেট অবশ্যি সব সময় তালাবন্ধ থাকে। খাবার ঘরে পা দেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল। আমি বললাম, দোতলায় কিছু হচ্ছে নাকিরে?

মীরাকে কোনো প্রশ্ন করলে কখনো তার সরাসরি জবাব দেয় না। সে বলল, কিছু হবার কথা নাকি?

ছোট চাচীর শরীর ভালো তো?

আমি কী করে বলব, আমি কি ডাক্তার?

মীরার কথাবার্তা থেকে ধরে নেয়া যায় যে, ছোট চাচী ভালেই আছেন। সন্ধ্যার। ঠিক মুখোমুখি একতলা যে পুরো খালি তার পেছনে কোনো কারণ নেই।

আমি মীরার পেছনে পেছনে রান্নাঘর পর্যন্ত এলাম। সে চা বানাতে যাচ্ছে বোধহয়। পরীক্ষার সময় মীরার খুব ঘন ঘন চা খেতে হয়। সে আবার অন্যের বানানট চা খেতে পারে না। বার বার নিজেই বানায়।

বসার ঘরে একটা সন্ন্যাসী বসে আছে, দেখেছিস নাকি মীরা?

হুঁ।

ব্যাটা কে?

ভোলাবাবু।

ভোলাবাবু এখানে কী চায়?

জানি না কী চায়। বড় চাচার কাছে আসে। গুজ গুজ করে কী সব বলে।

চা বানাচ্ছিস নাকি?

হুঁ।

আমাকে এককাপ দিতে পারবি?

না।

মীরা চলায় কেতলি চাপিয়ে মেপে এককাপ চায়ের পানি দিল, এর পরেও রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে দেখাতে হবে যে মীরার এই ব্যবহারে আমি মোটেই আহত হই নি।

তোর পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে?

যে রকম হবার সে রকমই হচ্ছে।

তুই কি স্বাভাবিকভাবে কোনো কথাই বলতে পারি না?

না।

মা কোথায়?

জানি না। বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে।

আমি বসার ঘরে চলে এলাম। তিনতলায় উঠা আপাতত স্থগিত। মার সঙ্গে কথা বলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তারপর যা হয় করা যাবে। এই সময়টা বরং সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলা যাক।

সন্ন্যাসী এখনো কান চুলকাচ্ছেন। এদের মতো মানুষও তাহলে জাগতিক আনন্দে অভিভূত হন? আশ্চর্য।

আপনার দেয়াশলাই-এর কাজ শেষ হয়েছে?

হয়েছে। নেন ভাইয়া।

কত দিন ধরে আপনি সন্ন্যাসী

জন্ম থেকেই। গেরুয়া ধরলাম ছয় বছর আগে। তার আগে নাঙ্গা বাবার শিষ্য ছিলাম কাপড় ছাড়া।

পুরো দিগম্বর? না নেংটি-ফেংটি ছিল?

কিছুই ছিল না।

লজ্জা করত না?

প্রথমে দুই একদিন করল, তারপর দেখি আর করে না। নাঙ্গা থাকলে শরীরটা ভালো থাকে। অসুখ-বিসুখ হয় না। যে একবছর নাঙ্গা ছিলাম জ্বর-জারি, সর্দি-কাশি কিছুই হয় নাই।

নাঙ্গা থাকলেই পারতেন, কাপড় ধরলেন কেন?

ঠিকই বলেছেন, আবার নাঙ্গা হতে ইচ্ছা করে। কাপড় গায়ে কুটকুট করে, সহ হয় না।

মীরা দরজার পর্দা ধরে দাঁড়াল। থমথমে গলায় বলল, দাদা, চা নিয়ে যা। আমি খানিকটা বিস্মিত হলাম। মীরা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শেষ পর্যন্ত করুণা করবে, এটা মনে হয় নি।

শুধু আমার জন্যে আনলি? সন্ন্যাসী ব্যাটার জন্যে আনলি না? ওকে সামনে রেখে খাব?

ও এই বাড়িতে কিছু খায় না।

তাই নাকি? কারণ কি?

জানি না।

আমি চা নিয়ে সন্ন্যাসীর সামনে বসলাম। সে এখন অতি দ্রুত পা নাচাচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ পা নাচানোর এই ব্যাপারটা অতি দ্রুত করতে পারে।

আপনি শুনলাম এই বাড়িতে কিছু খান না।

ঠিকই শুনেছেন।

কারণ জানতে পারি?

যেসব বাড়িতে পাপকার্য হয়, সেসব বাড়িতে আমি খাদ্য গ্রহণ করি না।

এই বাড়িতে পাপকার্য হয়?

হুঁ, হয়।

ফাজলামি করছেন নাকি?

না।

আমার তো মনে হয় করছেন।

না। করছি না। আমি সন্ন্যাসী মানুষ। ফাজলামি করব কেন?

প্রচণ্ড একটা ধমক দেব দেব করেও শেষ পর্যন্ত দিলাম না। ধমকা-ধমকি আমার স্বভাবে নেই। ব্যাটা যদি মনে করে এই বাড়িতে প্রচুর পাপকার্য হয় তাহলে মনে করুক, কিছুই যায় আসে না।

কী ধরনের পাপকার্য এ বাড়িতে হচ্ছে?

তা তো আপনারাই ভালো জানেন।

জানি না বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।

সন্ন্যাসীর কিছু বলার সুযোগ হল না। বড় চাচা ঢুকলেন। তাঁর হাতে বাজারের দুটো প্রকাণ্ড থলি। বড় চাচার পেছনে মা। মার পেছনে ইরা। এই প্রসেশন-এর অর্থ হল—আজ বুধবার, সাপ্তাহিক বাজারের দিন। সাপ্তাহিক বাজার চাচা নিজে করেন এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে করেন। সেই দিন তাঁর সঙ্গে দু তিন জন থাকতে হয়। যাদের কাজ হচ্ছে তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরা এবং যখনই তিনি কিছু কেনেন তখন বলা—জিনিসটা সস্তায় কেনা হয়েছে।

বড় চাচা সন্ন্যাসীকে দেখে বিরক্তমুখে বললেন, আজ আপনি এসেছেন কেন? আপনাকে বলেছি না বুধবারে কখন আসবেন না। সেটা বলার পরেও দেখি প্রতি বুধবার এসে বসে থাকেন। এর মানে কি?

দিনক্ষণ আমার খেয়াল থাকে না স্যার। গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর মুখে স্যার শব্দটা একেবারেই মানায় না। সন্ন্যাসীর মধ্যেও আজকাল সম্ভবত ভেজাল ঢুকে গেছে।

স্যার, আমি কী চলে যাব?

হুঁ, চলে যান। বুধবারে কখন আসবেন না। নেভার।

আচ্ছা। বুধবার বাদ দিয়েই আসব। আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে বুধবারও যা, বৃহস্পতিবারও তা। সব সমান।

যখন-তখন আসারও দরকার নেই। আমি খবর পাঠালে তবেই আসবেন?

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম! সবে বাজার এসেছে। দুটোর আগে আজ খাওয়াদাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অনেকক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া যেতে পারে।

আগেই বলেছি, আমার ঘর তেতলার ছাদে। এটাকে ঘর বলাটা ঠিক হবে না। জিনিসপত্র রাখার জন্যে চিলেকোঠার মত একটা জায়গা আছে, যার ছাদ করোগেটেড টিনের। দিনের বেলা এখানে ঢোকা যায় না। গরমে টিন তেতে থাকে। তবে রাত আটটা নটার পর খুব আরাম। একটাই অসুবিধা-জানালা নেই বলে দরজা খুলে রাখতে হয়। রোজই ঘুমুবার সময় একটু ভয় ভয় লাগে। যদি ঘুমের ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে ছাদে চলে যাই। আমাদের তেতলার ছাদে এখনও রেলিং হয় নি। বর্ষার সময় ছাদ খুব পিচ্ছিল হয়ে থাকে।

শার্ট খুলে বিছানায় এলিয়ে পড়তেই মা ঢুকলেন। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে বসলাম। তিনি সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে কখনো আমার ঘরে আসেন না। যখন আসেন তখন বুঝতে হবে ব্যাপার গুরুত্তর। আমি বললাম, কী ব্যাপার মা?

মা তেমন ভনিতা করতে পারেন না। সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে আসেন। আজও তাই করলেন। শীতল গলায় বললেন, তোর ছোট চাচার ব্যাপার কিছু জানিস?

কোন ব্যাপার?

ঐ নার্স মেয়েটার সঙ্গে এর কিছু আছে নাকি বল তো?

আমি কী করে বলব?

তোর এই ছাদে এসেই তো দুজন ঘোরাঘুরি করে। তুই জানবি না কেন?

দুজন ছাদে আসে তোমাকে বলল কে?

ইরা বলেছে।

ইরা বললে মোটেই পাত্তা দিও না। ইরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে।

তোর ছোট চাচাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে কেন?

তাছাড়া ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয়, তোমার তো কিছু করার নেই। ছোট চাচা কচি থোক না। সে যদি মনে করে সমিতাকে বিয়ে করবে তাহলে করবে। এটা তার ব্যাপার।

সমিতা আবার কে?

নার্সটার নাম সমিতা।

বিয়ে করার কথা আসছে কেন?

প্রেম হলে বিয়েও হতে পারে।

তোর ছোট চাচা কি তোকে কিছু বলেছে?

আমি অতি দ্রুত চিন্তা করলাম সত্যি কথাটা মাকে বলব, না কি বলব না। ছোট চাচা আমাকে যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এই ভেবেই বলেছেন যে আমার মাধ্যমে খবরটা আস্তে আস্তে ছড়াবে। এইসব ব্যাপার সরাসরি বলার চেয়ে ভায়া মিডিয়ায় বলা অনেক নিরাপদ। আর বলতেই যখন হবে; বাড়িয়ে বলাই ভালো। বিয়ে হয়ে গেছে বলে দেখা যাক কী রিএ্যাকশন হয়।

কথা বলছি না কেন? কিছু বলেছে?

হুঁ।

কী বলেছে?

সমিতাকে বিয়ে করেছেন এই রকম একটা কথাই মনে হল শুনলাম।

ফাজলামি করছিস কেন?

মোটেই ফাজলামি করছি না।

মা আমার বিছানার একপাশে বসে ডাঙায় ভোলা মাছের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। তার প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ছোট চাচা ছাদে উঠে এসে বললেন, ভাবী আছেন নাকি? একটু আসুন তো, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

ছোট চাচা মার সঙ্গে কথা বলছেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। আমার ঘর থেকে তাঁদের কথা শোনা যায় না, কাজেই আমি সিঁড়ির দরজার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে এলাম। নিঃশব্দে চলাফেরাটা আমি বেশ ভালো পারি।

ছোট চাচাকে মনে হল খুবই স্বাভাবিক। সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছেন। প্রতিটি শব্দ বেশ স্পষ্ট, তবে মাঝে মাঝে তিনি এমন নিচু পর্দায় চলে যাচ্ছেন যে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই তুলনায় মার গলা ভয়াবহ। এমন চেঁচামেচি করছেন যে একতলার লোকজনও শুনতে পাচ্ছে বলে আমার ধারণা। মা এই ব্যাপারটা খুব সম্ভব ইচ্ছা করেই করছেন। একই সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েরা খুব বুদ্ধি খাটাতে পারে। তাঁদের কথোপকথনের ধরনটা এ রকম–

ছোট চাচা : আস্তে কথা বলুন ভাবী, চেঁচাচ্ছেন কেন?

মা : তুমি অকাম-কুকাম করবে আর আস্তে কথা বলব আমি? তুমি পেয়েছ কী?

ছোট চাচা : চিৎকার করে লাভ তো কিছু হচ্ছে না।

মা: এর মধ্যে লাভ-লোকসান কি? তুমি বৌ থাকতে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছ। সেই বৌ এখন যায় তখন যায়।

ছোট চাচা : বিয়ের কথা কোত্থেকে এল? কি মুশকিল। ভাবী প্লিজ, চেঁচাবেন না।

মা : চেঁচাব না মানে? চেঁচানির তুমি দেখেছ কী? দরকার হলে গোটা ঢাকা শহর আমি ঢোল দিব। মাইক ভাড়া করব।

ছোট চাচা; করুন আপনার যা ইচ্ছে।

রঙ্গমঞ্চ থেকে ছোট চাচা প্রস্থান করলেন। মা খানিকক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর সিঁড়ি ভেঙে থপথপ করে উঠে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জমিদার-গিন্নীদের গলায় বললেন, শুনেছি কিছু?

আমি বললাম, না। কি ব্যাপার?

তোর ছোট চাচা ঐ নার্স ব্যাটিকে বিয়ে করে ফেলেছে। তুই যা বলেছিস তাই।

মা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বড়-বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। দম নিচ্ছেন। চিৎকার করে দম ফুরিয়ে গেছে। মার দম ফিরে এলে তিনি টানা গলায় বললেন, আমার মনে হয় ঘটনাটা অন্য। ঘটনাটা অন্য মানে? এমন কিছু একটা হয়েছে যে বিয়ে না করে উপায় নেই। প্রেম-ফ্রেম কিছু না।

আমি মার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হলাম। মাঝে মাঝে মা এমন বুদ্ধির ঝিলিক দেখান। উদাহরণ দেই। অরুণানামে মীরার এক বান্ধবী আছে। কলেজের বান্ধবী। প্রায়ই টেলিফোন করে। প্রথমে সে চায় আমার মাকে। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে। কেমন আছেন খালামা? আজ কী রান্না করেছেন? তারপর তার গল্প শুরু হয় মীরার সঙ্গে। সেই গল্প আর শেষ হতে চায় না। একদিন এরকম গল্প চলছে, মা এসে ফট করে মীরার হাত থেকে টেলিফোন

নিয়ে কানে ধরলেন। ওপাশ থেকে মিষ্টি মিষ্টি গলায়। একটা ছেলে কথা বলছে। মা টেলিফোন রেখে বজ্রকণ্ঠে বললেন, মীরা। এ হারামজাদা কে? কে এই হারামজাদা? আর অরুণাইবা কে?

মীরা ছুটে পালিয়ে গেল। আমরা মীরার কাণ্ডকারখানায় হলাম বিস্মিত, মার বুদ্ধি দেখে হলাম চমৎকৃত। মীরা অবশ্যি কিছুদিন বেশ যন্ত্রণা দিল। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আমাদের কাজের ছেলেকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে দশটা ঘুমের ট্যাবলেটও কিনে আনল। মা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, ঠিক আছে, ঐ ছেলের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। বি.এটা পাস করুক।

ঐ ছেলে বি.এ পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে যাওয়ায় আমাদের অ হয়ে গেল। মীরার প্রেম বাতাসে উড়ে গেল। কম্পার্টমেন্টাল পাওয়া ছেলেদের প্রতি মেয়েদের প্রেম থাকে না।

যাই হক, পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। রাতে নিচে খেতে গিয়ে দেখি, ছোট চাচার ব্যাপারটা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছে।

মীরা বলছে, আমি যা আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ইদানীং কেমন সেজেগুজে আসছিল।

এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা। সমিতা এ বাড়িতে সব সময় নার্সের পোশাক পরে আসে। বাড়তি কোনো রকম সাজসজ্জা তার নেই। সে আসে, নিজের মনে কাজ করে যায়। তাকে নিয়ে আমার বোনেরা যেসব কথাবার্তা বলে তা হচ্ছে কী দেমাগ। চার পয়সা দামের নার্সের এত দেমাগ হয় কী করে। তাও যদি চেহারাটা ভালো হত। আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং। ঠোঁট দুটা পুরুষদের ঠোঁটের মতো মোটা।

এসব কথার কোনোটাই সত্যি নয়, সমিতার গায়ের রং কালো এবং ঠোঁট দুটাও মোটা, তবু এই মেয়ের দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে হয়। মীরা এবং ইরা যে এত কথা বলে তার কারণ সম্ভবত ঈর্ষা।

খাবার টেবিলে ছোট চাচাকে নিয়েই আলাপ চলতে লাগল। টেবিলে আছি শুধু আমরা অর্থাৎ মীরা, ইরা এবং বাবা। মা খাবার-দাবার এগিয়ে দিচ্ছেন এবং রাগে গন গন করছেন। মীরা-ইরা কিছুক্ষণ পর পর বলছে, এরকম একটা কুৎসিত কাজ কী করে করল। নার্স বিয়ে করে ফেলল–ছিঃ! এক পর্যায়ে বাবা বললেন, থা তো। একটা ব্যাপার নিয়ে এত কথা! বিয়ে যে করেই ফেলেছে এমন তো নাও হতে পারে। এই নিয়ে আর কোনো ডিসকাসন যেন না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই থেমে গেল। কোন কারণ ছাড়াই আমরা বাবাকে বেশ ভয় পাই। এর মধ্যে মাও আছেন। তিনি ভয় পান সবচে বেশি।

বাবা ডাল দিয়ে ভাত মাখাতে মাখাতে বললেন, এসব হচ্ছে পারিবারিক স্ক্যান্ডেল। ধামাচাপা দিতে হবে। মা ক্ষীণ গলায় বললেন, বিয়ে করে বসে আছে, এই জিনিস তুমি ধামাচাপা দেবে কিভাবে?

বাবা এমন ভঙ্গিতে মার দিকে তাকালেন যেন মার মুখতায় তিনি খুবই বিস্মিতবোধ করছেন। এই দৃষ্টিটি তিনি কোত্থেকে শিখেছেন কে জানে, তবে খুব ভালো শিখেছেন। এই দৃষ্টির মুখোমুখি আমাদের প্রায়ই হতে হয় এবং আমরা খুবই সংকুচিত বোধ করি।

বাবা হাত ধোবার জন্যে উঠতে উঠতে বললেন, সমস্যা যেমন আছে, সমস্যার সমাধানও আছে। আসগরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

জাজ সাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়ে এজলাস থেকে নেমে গেলেন এরকম ভঙ্গিতে বাবা নিজের ঘরে রওনা হলেন। আমি ছোট চাচাকে খবর দিতে গেলাম।

ছোট চাচা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। বারান্দায় আলো নেই বলে তাঁর মনের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারে বসে আছেন দেখে বোঝা যাচ্ছে মন আলো নেই। যাদের মন হাসি-খুশি তারা বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকতে পারে না।

কী করছ চাচা?

কিছু করছি না। আঁধারের রূপ দেখছি। আচ্ছা, তুই কী বিয়ে নিয়ে কিছু বলেছিস? আমি সমিতাকে বিয়ে করে ফেলেছি এই জাতীয় কিছু?

বলেছি।

ছোট চাচা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভালই করেছিস। বিয়ে করে ফেললে কী রিএ্যাকশন হবে এ্যাডভান্স জানা গেল।

তোমাকে বাবা ডাকছেন।

কেন?

কোর্ট মার্শাল হবে বলে মনে হচ্ছে।

বলে আয় ঘুমিয়ে পড়েছি।

খাওয়া-দাওয়া করেছ?

আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোক ভাবতে হবে না। তুই একটা কাজ কর তো—ছোট চাচীর ঘরে যা।

কী কবর ঘরে গিয়ে?

দেখে আয় সে ব্যাপারটা শুনেছে কি না।

আমার মনে হয় শুনেন নি।

মনে হওয়া-হওয়ি না-তুই জেনে আয়।

আমি ছোট চাচীর ঘরের দিকে রওনা হলাম। তাঁর ঘরে ঢোকার অনেক সমস্যা আছে খালি পায়ে ঢুকতে হয়। ছোট চাচী দিনের মধ্যে সতের বার মেঝেতে পা ঘষে ঘষে দেখেন বালি কিচমিচ করছে কি না। ছোট চাচীর ভাষায় তিনি পৃথিবীর সবকিছু সহ্য করতে পারেন, তবে, মেঝেতে বালি থাকলে তা সহ্য করতে পারেন না।

ছোট চাচীর ঘরে আসবাবপত্রও তেমন নেই। কারণ, শোবার ঘরে তিনি আসবাবপত্র সহ্য করতে পারেন না, তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। তাঁর প্রকাণ্ড ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা

খাট। একপাশে গোল একটা টেবিল। সেই গোল টেবিলের মাঝখানে কাচের ফুলদানিতে দুটা গোলাপ। এই গোলাপ আসে তাঁর বাবার বাড়ি থেকে। ছোট চাচীর বাবা রিটায়ার্ড জাজ হামিদুর রহমান সাহেব বর্তমানে গগালাপের চাষ করেন। ঢাকা শহর গোলাপ সমিতির তিনি সহ-সভাপতি। তাঁর বাগানে একান্নটা গোলাপের গাছ আছে। তিনি প্রতিদিন বাগানের গোলাপ তাঁর চার মেয়ের বাসায় দুটা করে পাঠান। সাইকেলে করে একটা শুটকো লোক গোলাপ দিয়ে যায়। এমনভাবে দেয় যেন সাত রাজার ধন দিয়ে যাচ্ছে। একবার আমার হাতে দিয়ে বলল, একটু কেয়ারফুলি ধরুন ভাই। আমি বললাম, কেন? বিষাক্ত না কি? লোকটা অত্যন্ত বিরক্ত হল।

পুরো ব্যাপারটা কেন জানি আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয়। রিটায়ার্ড জাজ হামিদুর রহমান সাহেবের এই গোলাপপ্রেমের বিষয়টি লোক-দেখানো বলেই আমার ধারণা। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি গদ গদ ভঙ্গিতে গোলাপ সম্পর্কে এত সব কথা বলেন যে, রাগে গা জ্বলে যায়। শেষবার যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন, জানো টুকু, ঘুমুবার আগে গোলাপের ঘ্রাণ না নিলে আমার আলো ঘুম হয় না।

আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, যেদিন সর্দি থাকে সেদিন কী করেন? নিশ্চয়ই ঘুমের খুব অসুবিধা হয়।

জাজ সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে চাইলেন আমি ঠাট্টা করছি কি না। আমি খুবই সরল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলাম যেন সত্যি সত্যি জানতে চাই সর্দি হলে উনি কী করেন। রিটায়ার্ড জাজ সাহেবের শেষ পর্যন্ত ধারণা হল, আমি ঠাট্টা

করছি না। জাজ সাহেবরা কে সত্যি কথা বলছে, কে বলছেনা, তা কখনো ধরতে পারেন না।

তিনি বললেন, সর্দি, জ্বর-জ্বারি এইসব আমার কখনো হয় না। গোলাপের ঘ্রাণে সম্ভবত রোগপ্রতিরোধী কোনো কিছু আছে। এটা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের যে শাখাটি নিয়ে সবচে কম গবেষণা হয়েছে তা হচ্ছে গন্ধ। The science of smell.

গোলাপপ্রেমী বাবার কন্যার অর্থাৎ আমার ছোট চাচীর গোলাপপ্রেম নেই। তিনি ফুল শুকে দেখেন না, কারণ ছোটবেলায় একবার টগর ফুল শুকেছিলেন, গন্ধের সঙ্গে সেই ফুলের ভেতর থেকে আধইঞ্চি লম্বা শুয়োপোকা তাঁর নাকের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ছোট চাচী বিছানা থেকে উঠে বসলেন। ঘটনাটা তিনি জানেন কি না তাঁকে দেখে তা বুঝতে পারলাম না। তাঁর গায়ে রাত-পোশক। সেই নীল রঙের রাত-পোশাক এতই স্বচ্ছ যে, আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

ছোট চাচী মিষ্টি গলায় বললেন, কী ব্যাপার টুকু?

কিছু না। আপনার খবর নিতে এলাম। শরীর কেমন?

শরীর ভালোই। আজ বুধবার না? শরীর খারাপ থাকবে কেন?

এই আরেকটা মজার ব্যাপার-সপ্তাহে তিনদিন ছোট চাচীর শরীর ভালো থাকে–বুধবার, শনিবার এবং সোমবার। বাকি চারদিন খুবই খারাপ। সপ্তাহের দিনক্ষণ দেখে শরীর খারাপ হয় কী করে, এটা একটা রহস্য।

যাই চাচী।

তুমি কি শরীরের খোঁজ নিতে এসেছিলে?

জ্বি।

এর আর খোঁজ নেবার কিছু নেই। শরীর আমার সারবে না। Mydaysare numbered.

চিকিৎসা তো হচ্ছে।

এর কোনো চিকিৎসা নেই। যত দিন যাচ্ছে গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় স্কিনে কোনো অনুভূতি নেই। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না, তাই না?

বিশ্বাস হবে না কেন? হয়।

উহুঁ, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা একদিন আমার বুকের স্কিন তোমাকে। দেখাব। নাকি এখনই দেখবে?

না থাক।

এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ডাক্তারকে যদি দেখাতে পারি, তোমাকে দেখাতে অসুবিধা কি? আমার এত লজ্জা-টজ্জা নেই।

আমি ছোট চাচীর ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। এই চাচীর সঙ্গে বেশি সময় থাকা খুবই বিপজ্জনক। এই ব্যাপারটা আগেও লক্ষ করেছি। একবার সন্ধ্যাবেলা কী কারণে যেন তাঁর ঘরে ঢুকেছি। ছোট চাচী ঘরে নেই। লাগোয়া বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে গোসল করছেন। বাথরুমের দরজা হাট করে খোলা। চাচী বললেন, কে, টুকু নাকি?

হ্যাঁ।

কাইন্ডলি ভোয়ালেটা দিয়ে যাবে? চোখ বন্ধ করে এসো। আমার গায়ে কিন্তু কাপড় নেই।

ঘর থেকে বেরুতেই ছোট চাচার সঙ্গে দেখা। তিনি সম্ভবত ছোট চাচীর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, ছোট চাচী এখনো কিছু জানেন না।

ঠিক বলছিস তো?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

গুড। আমি নিজেই তাহলে বলব। তোর কাছে সিগারেট থাকলে আমাকে দিয়ে। যা।

যা করবে বুঝে-সুঝে করবে।

তোর উপদেশের যখন প্রয়োজন বোধ করব তখন জানাব। এই মুহূর্তে আমার প্রয়োজন নেই।

আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করছি। ছোট চাচা তা না নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি পড়ার শব্দ হল।

ঘুমুতে যেতে অনেক দেরি হল। বড় চাচা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি অসাধারণ বই পেয়েছেন। আমাদের পড়ে শোনাবেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল— বাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনা তিনি কিছুই জানেন না। অবশ্যি না জানার কোনো কারণ নেই। বড় চাচার সেবা-যত্নের জন্যে কমলা নামের যে মেয়েটি আছে সে দুর্দান্ত স্পাই। কোথায় কী হচ্ছে টুক করে তাঁর কানে তুলে দেয়।

মীরা, ইরা এবং আমি তিনজনই এসেছি। মীরা বলল, পরীক্ষার পড়া পড়তে হবে, আজ থাক।বড় চাচা বললেন, আধঘণ্টার বেশি লাগবে না। একটা মাত্র চ্যাপ্টার পড়ব। চ্যাপ্টারটার শিরোনাম হল ইনফিনিটি এন্ড মাইন্ড। অসাধারণ জিনিস। ভাবছি, অনুবাদ করে ফেলব। দশ জনে পড়বে। এতে সমাজে একটা উপকার হবে। কমলা, আমাদের জন্য কফি বানাও তো।

চা এবং কফির সরঞ্জাম বড় চাচার ঘরেই থাকে। কমলা ইলেকট্রিক হিটারে পানি গরম করে ব্রেন্ডারে চমৎকার এক্সপ্রেসো কফি তৈরি করে। বড় চাচার ঘরে মাঝে মাঝে আমি কফির লোভই আসি। এমিতে বোকা মানুষের সঙ্গ আমার বিশেষ ভালো লাগে না। বড়

চাচা শুধু বোকা তাই না, বেশ বোকা। তিনি ছাড়া এই তথ্যটি সবাই জানে। কমলাও জানে।

বড় চাচা বললেন, কি, পড়া শুরু করব? ফুল এ্যাটেনশনে শুনবি। পড়ার সময় কাশাকাশি-হাসাহাসি যেন না হয়। কারুর বাথরুমে যাবার ব্যাপার থাকলে এক্ষুনি সেরে আয়।

আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। ফিরলাম খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে। বাথরুমে লাল বালতিতে কমলার শাড়ি। সে কি বড় চাচার বাথরুম ব্যবহার করে? তা তো করার কথা না। তাদের বাথরুম আলাদা।

কমলা কফির কাপ এনে হাতে দিল। তার গা থেকে ভুরভুর করে গন্ধ আসছে। গায়ে সেন্ট দিয়েছে বোধহয়।

কমলার বয়স কত? ত্রিশ, না কি আরো কম?

বড় চাচা বললেন, কমলা, তুমিও খাও। সবাইকে বানিয়ে দেবে, নিজে খাবে না এটা তো ভালো কথা না। খাও, কথা না, খাও, তুমি খাও। আই ইনসিস্ট।

৩. মৃত মানুষকে ভুলে যেতে

এক জন মৃত মানুষকে ভুলে যেতে আমাদের কত দিন লাগে?

তীব্র শোক কাটতে লাগে দুদিন, তীব্র শোকের পরের অংশ ভোঁতা শোক কাটতে দশ দিনের মতো লাগে। কোনো রকমে পনের দিন কাটিয়ে দিতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। তখন আর মৃত মানুষদের কথা মনেই থাকে না। মানুষ অতি উন্নত প্রাণী বলেই শোক পনের দিনের মতো ধরে রাখে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা চর্বিশ ঘন্টার বেশি ধরে রাখতে পারে না।

আমাদের কাজের মেয়েটি একবার ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে বিড়ালের তিনটা বাচ্চা মেরে ফেলল। মা-বিড়ালটা পাগলের মতো হয়ে গেল। নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে একেকজনের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ছে, ছটফট করছে। মা-বিড়ালের দুঃখ দেখে আমরা সবাই অভিভূত হয়ে গেলাম। কাজের মেয়েটাকে তার নৃশংসতার জন্যে মাসের পুরো বেতন দিয়ে বরখাস্ত করা হল। সে হাসিমুখে তার টিনের সুটকেস নিয়ে মিরপুরে চলে গেল। চব্বিশ ঘন্টা পর দেখা গেল মা-বিড়াল তার সন্তান-শোক ভুলে দিব্যি। খাওয়া-দাওয়া করছে। বিকেলে রোদে শুয়ে আরামে হাই তুলছে। এদিকে মতির মার অভাবে সংসার হয়েছে অচল। ঢাকা শহরে কাজ করতে পারে, এ রকম কাজের মেয়ে বাঘের চোখের মতোই দুর্লভ। কাজেই পরদিন সকালে আমি নিজেই মতির মাকে আরো কুড়ি টাকা বেশি বেতন কবুল করে নিয়ে এলাম। তিনটি বিড়ালছানা-হত্যার জন্য মতির মার কুড়ি টাকা বেতন বেড়ে গেল। মাস চারেকের মধ্যে মা-বিড়ালটা বাচ্চা দিল। নিজের ক্ষমতা জাহির করবার জন্যেই মতির মা ঐ বাচ্চা কটিকেও আগের ভঙ্গিতে ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে মারল। আমরা এইবার তাকে আর কিছু

বললাম না। আর আশ্চর্য, মা-বিড়ালটাও আগের মতো হৈচে, দৌড়-ঝাঁপ করল না। সে হয়ত ইতিমধ্যে কন্ডিশন্ড হয়ে গেছে। ধরেই নিয়েছে, একেকবার বাচ্চা হবে এবং মতির মা ঝাড়ু দিয়ে সেগুলোকে পিটিয়ে মারবে। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা সে গ্রহণ করেছে শান্ত ভঙ্গিতে।

আমরা মানুষরাও কি তাই করি না? .

মেজো খালার উত্তর শাহজাহানপুরের বাসায় পা দিয়ে এই জাতীয় কিছু। ফিলসফিক চিন্তা মাথায় এল। এই বাড়িটির সঙ্গে আমার মেজো খালুর অনেক দুঃখকষ্ট এবং স্বল্প জড়িয়ে আছে। এই বাড়ির প্রতিটি ইটে তাঁর মমতামাখা। অথচ বেচারা এই বাড়িতে উঠবার দুদিন আগে মরে গেলেন। প্রকৃতির কী ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। অথচ ফরিদা খালাকে দেখে মনে হল প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতাকে তিনি শান্ত ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন। হাসি-খুশিতে বাগানে কী যেন একটা চারা লাগাচ্ছেন। আমি বললাম,

আপনাদের নতুন বাড়ি দেখতে এলাম খালা।

খালা আনন্দিত স্বরে বললেন, আয় আয় আয়।

বাড়ি কোথায় খালা, এ তো দেখি রাজপ্রাসাদ। হুলস্থূল কারবার।

আনন্দে খালার মুখ আরো উজ্জ্বল হল। তিনি প্রায় কিশোরীদের গলায় বললেন, বাইরে থেকে বড় দেখায়, আসলে অত বড় না। রুমগুলো ছোট ছোট।

তাই নাকি?

শুধু মাস্টার বেডরুমটা বেশ বড়। অন্যগুলো ছোট।

রুম সব মিলে কটা?

খালা হড়বড় করে রুমের সংখ্যা, বাথরুমের সংখ্যা, স্টোররুমের আয়তনের কথা বলতে লাগলেন। আমি এমন ভঙ্গি করলাম যেন গভীর আগ্রহে শুনছি। শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। নিজের আগ্রহটা বোঝাবার জন্যে দুএকটা টুকটাক প্রশ্ন করতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে মাথা নাড়াতে হচ্ছে।

বুঝলি টুকু, স্টোররুমটাকে অনায়াসে একটা ঘর করা যায়। বড় জানালা আছে, সিলিং ফ্যান লাগাবার ব্যবস্থা আছে। ভাবছি ঐটাকে একটা ঘর করব।

কিন্তু আপনার তো একটা স্টোররুম দরকার।

কোনোই দরকার নেই। রান্নাঘরেবিট-ইনকআছে। রাজ্যের জিনিস সেখানে রাখা যায়।

তাহলে তো চমৎকার।

ভালে আর্কিটেক্ট দিয়ে বাড়ি করবার এই হচ্ছে সুবিধা। নর্বই হাজার টাকা নিয়েছে আর্কিটেক্ট। তখন সবাই বলেছে, এত টাকা আর্কিটেক্টকে দেয়ার দরকার কী? তারা যাকরবে তা তো জানাই আছে। থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়। আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। এখন দেখলাম আর্কিটেক্টের দরকার আছে।

তবে যে বললেন রুমগুলো হোট ছোট হয়েছে।

মডার্ন আর্কিটেক্ট রুম ছোট ছোট হয়। বড় রুম দিয়ে তুই কররি কী? ফুটবল খেলার জন্য তো রুম না।

তা তো বটেই।

তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তুই এসেছিস খুব ভালো হয়েছে। তোদর বাড়ির কি সব উড়ো খবর পাচ্ছি। সত্য-মিথ্যা তাও জানি না। টেলিফোন করে যে খোঁজ নেব সেই উপায়ও নাই। টেলিফোন কানেকশন এখনো দেয় নি। সপ্তাহ খানিকের মধ্যে নাকি দেবে। ওদের বিশ্বাস নেই। শেষ পর্যন্ত টাকাই খাওয়াতে হবে। তুই ভেতরে গিয়ে বোস, আমি চারা কটা লাগিয়ে আসছি।

রিমি আছে?

হ্যাঁ, আছে। ওর শরীরটা ভালো না। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, ডাক্তার এখন আসে নি। একা কদিক সামলাব?

রিমি হলুদ রঙের একটা চাদর জড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটের উপর বসেছিল। তার কোলের উপর একটা বই। গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও তার মাথার উপর ফুলস্পিডে ফ্যান ঘুরছে। রিমিকে দেখে একটু মন খারাপ হল। যে কোন সুন্দর জিনিসের মধ্যে মন খারাপের একটা উপাদান থাকে। রিমিকে যখনই দেখি তখনি মনে হয় আগের বার যে রকম দেখেছিলাম, তারচে সে আরো সুন্দর হয়েছে। আজ তার শরীর ভালো না। চোখের নিচে কালি পড়েছে। অথচ কি আশ্চর্য, চোখের এই কালিও মানিয়ে গেছে।

রিমি বয়সে আমার মাস তিনেকের বড়। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে খানিকটা জটিলতা আছে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা না হলে সে আমাকে চিঠি লিখবে। সেইসব চিঠিকে সরল বাংলায় প্রেমপত্র বলা ছাড়া উপায় নেই। চিঠি পড়লে মনে হবে, আমাকে না দেখার কষ্টে সে মরে গেছে। কিন্তু সেই চিঠি পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলে সে কেন জানি বিরক্ত হয়। আমি একবার তার আবেগপূর্ণ চিঠির জবাবে কিছু গাঢ় কথা লিখে ফেলেছিলাম, সে দারুণ রাগ করেছিল। টেলিফোন করে বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এইসব তুই কী লিখেছিস? ছিঃ! তুই ছোটভাই, ছোটভাইয়ের মতো থাকবি। এসব কী! তুই কি আমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলতে চাস? রাগে আমার গা-টা জ্বলে যাচ্ছে।

বলেই সে টেলিফোন খট্ করে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন। এবারে গলা আগের চেয়েও চড়া-টুকু শোন্ আমাদের বাড়িতে আর আসবি না। তোর মনের মধ্যে পাপ আছে। খবরদার, তুই কিন্তু আসবি না।

আমি ঐ বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। এক মাসের মাথায় রিমির চিঠি এসে উপস্থিত। আবেগে টইটমুর চিঠি।

আজ যে এই বাড়িতে এসেছি সেও চিঠি পেয়ে। তাও এমন চিঠি, যেই পড়বে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

রিমি আমাকে দেখে কোল থেকে বই নামিয়ে বলল, তুই দেখি বাগানে মার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললি।

হ্যাঁ, বললাম।

কী কী কথা হল শুনি।

তেমন কিছু না।

যেমনই হোক কথাগুলো আমি শুনতে চাই।

বললাম তত, ইম্পর্টেন্ট কোনো কথা হয় নি। বাড়ি নিয়ে কথা হল। রুমগুলো ছোট ছোট, এইসব।

রিমি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বাবার সম্পর্কে মা কি তোর সঙ্গে কোনো কথা বলেছেঃ হা কিংবা না বলবি। হয়েছে কোনো কথা?

না।

বাবা মারা গেলেন পনের দিনও হয় নি। আজ হচ্ছে ফোর্টিনথ ডে, অথচ মা বাবার সব স্মৃতি মুছে ফেলেছে। সারাক্ষণ বাড়ি বাড়ি করছে। ঘর সাজাচ্ছে। বাগান করছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করছি। তাঁকে দেখে যে কেউ বলবে—এক জন সুখি মহিলা। ওজন পর্যন্ত বেড়েছে। পরশু রাতে বাথরুমে গুন গুন করে গান গাইছিল।

কষ্টের একটা ব্যাপার সারাক্ষণ মনে রেখে লাভ নেই। কেউ রাখেও না। তুইও রাখবি না। কিছুদিন পর দেখা যাবে তুইও দুপুরবেলা শিবরামের বই পড়ে খিলখিল করে আসছিল।

টুকু, আমাকে তুই তুই করে বলবি না। তোর মুখে তুই শুনতে খুব খারাপ লাগে।

আচ্ছা বলব না।

বোস। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

আমি বসলাম। রিমি তার গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে কাছে এগিয়ে এল। গলার স্বর নিচু করে বলল, আনন্দে মার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে।

আমার তো মনে হয় তোর নিজের মাথাই এলোমেলে।

আমার মাথা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। আর তা নেই। বাবার টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

ছিনিমিনি খেলছে মানে?

রকিব সাহেব বলে এক ভদ্রলোককে দুলাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। উনি ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা করবেন এবং তার আয় থেকে মাকে মাসে মাসে সাত হাজার টাকা দেবেন। ঐ টাকায় আমাদের সংসার চলবে।

ব্যবস্থা তত ভালেই মনে হচ্ছে।

তোর মাথা মোটা, এই জন্যে তোর কাছে ব্যবসা ভালো বলে মনে হচ্ছে। ঐ লোকটা ধুরন্ধর প্রকৃতির।

বুঝলি কী করে?

আমি বুঝতে পারি। মানুষের চোখের দিকে তাকালেই সেই মানুষটা কেমন আমি বুঝতে পারি। যেমন ধর, তুই-তুই হচ্ছিস বোকা।

শুনে ভালো লাগল।

শুনে তোর ভালো লাগছে। কারণ তুই বোকাই থাকতে চাস। বোকা থাকার মজা আছে, এইটা তুই টের পেয়ে গেছিল।

রকিব সাহেব লোকটা কে?

বাবার বন্ধু। আগেও আসত। তখন ড্রয়িং রুমে বসে ভিসিআর দেখত। এখন সরাসরি মার শোবার ঘরে উঁকি দেয়।

উকি দেয়া এবং ঢুকে যাওয়া তো এক না।

এখন উঁকি দিচ্ছে। দুদিন পরে ঢুকবে।

রিমি আবার চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে ফেলল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই তো জানি না আমরা এখন সমস্ত আত্মীয়স্বজন থেকে আলাদা। মা আমার সব চাচাদের সঙ্গে ঝগড়া করছেন।

কারণ কি?

মার ধারণা, সব চাচাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের টাকা-পয়সা হাতানো। মা তা হতে দিতে চান না।

তোদের কি অনেক টাকা নাকি?

মনে হচ্ছে তাই। অবশ্যি আমি ঠিক জানি না। বাবার তিনটা ইস্যুরেন্স ছিল। সেখান থেকে টাকা এসেছে। ফিক্সড ডিপোজিট ছিল। ডিফেন্স বন্ড ছিল। সাভারে জমি আছে দুবিঘা। নিউ এয়ারপোর্টের কাছে দশ কাঠা জমি কেনা হয়েছে। মগবাজারে একটা ফ্যাট কেনা আছে। চারতলায় ফ্ল্যাট।

বলিস কী।

বাবা অসৎ লোক ছিলেন তা জানতাম কিন্তু এতটা অসৎ ছিলেন তা জানতাম না। যতই জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তির খবর পাচ্ছি ততই অবাক হচ্ছি।

অসৎ মানুষের ছেলেমেয়েদের জীবন মোটামুটি সুখেরই হয়। তাদের টাকাপয়সার অভাব থাকে না। ভোর জীবনটা সুখেই কাটবে।

রিমি ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, শুয়ে থাক, তোর বোধহয় জ্বর বাড়ছে।

রিমি ক্লান্ত গলায় বলল, দিন দিন তোর চেহারা এত খারাপ হচ্ছে কেন?

খারাপ হচ্ছে নাকি?

কেন, আয়নায় নিজেকে দেখিস না? তোকে দেখাচ্ছে বাসের কন্ডাকটরদের মত। আচ্ছা, তুই এখন যা, তোর সঙ্গে কথা বলতে এখন আর ভালো লাগছে না।

মেজো খালার বাগানের কাজ শেষ হয়েছে। তিনি ঝরনার পানিতে হাত ধুচ্ছেন। আমাকে বেরুতে দেখে অপ্রসন্ন গলায় বললেন, কথা হয়েছে রিমির সঙ্গে?

হুঁ।

ও কী বলল?

তেমন কিছু না।

আহ শুনি না। কী বলল? আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে?

না।

আমার শত পুরুষের ভাগ্যি। ও তো আমাকে এখন দুচোখে দেখতে পারে না। এমন সব কথা বলে যে, ইচ্ছে করে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যাই। আমি নাকি তার বাপের সম্পত্তি নয় ছয় করছি। ওর আছে কী যে আমি নয় ছয় করব? একটা দারোয়ান রেখেছি, একটা মালী রেখেছি। অনুচিত হয়েছে? তুই বল।

না। অনুচিত হয় নি।

রিমির ধারণা, দারোয়ানমালী এসব আমাদের দরকার নেই। আমরা দুজন মোটে মেয়েমানুষ, একা একা থাকি। দারোয়ান-মালী ছাড়া চলবে কিভাবে?

তা তো বটেই।

এসব কথা থাক। তোর কাছে তোদর কথা শুনি।

কী শুনতে চান?

তোদের বাড়িতে হচ্ছেটা কী?

কিসের কী হচ্ছে?

ন্যাকা সাজবি না। ভোর ন্যাকা ভাবটা অসহ্য। তোর ছোট চাচা নাকি কোন নার্সকে বিয়ে করে ফেলেছে?

এ রকম অবশ্যি শোনা যাচ্ছে। সত্যি-মিথ্যা জানি না।

আমি তো শুনলাম, ঐ হারামজাদীকে বাড়িতে নিয়ে তুলেছে। তোর ছোট চাচী ঘুমের ওষুধ খেয়ে মর মর।

সে রকম কিছু না তো!

বলিস কী?

যা শুনছ সবই গুজব। বাসায় বলতে গেলে কিছুই হয় নি। খুবই শান্ত পরিস্থিতি। এত শান্ত যে মনে হচ্ছে ছোট চাচা সম্পর্কে যা শুনছি, তাও গুজব।

মেজো খালা এমনভাবে তাকালেন যেন বঝতে চেষ্টা করছেন আমি সত্যি বলছি না। মিথ্যা বলছি। আমার মুখ দেখে তা বোঝা বেশ শক্ত। আমি মিথ্যা কথা বলার সময় খুব স্বাভাবিক থাকি। অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ মানুষও দ্বিধায় পড়ে যায়। মেজো খালা যেমন দ্বিধায় পড়ে গেছেন।

যাই খালা।

চাটা কিছু খেয়ে যা।

আজ একটা জরুরি কাজ আছে। অন্যদিন এসে চা খেয়ে যাব।

তোদের বাসায় তাহলে কোনো ঝামেলা নেই।

উহুঁ।

বাসায় ঝামেলা নেই কথাটা এক শ ভাগ মিথ্যা। অসম্ভব ঝামেলা চলছে। ছোট চাচী সত্যি সত্যি ঘুমের ওষুধ খেয়ে কেলেংকারি কাণ্ড করেছে। ছোট চাচীর বাবা রিটায়ার্ড জাজ সাহেব

বলেছেন, তিনি দেখে নেবেন। আমার বড় চাচা ঘন ঘন মিটিং করছেন। ছোট চাচাকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। বড় চাষীকে আমেরিকায় টেলিফোন করা হয়েছে। শুক্রবারে তাঁর আসার কথা।

ছোট চাচা কদিন ধরেই চেম্বারে যাচ্ছেন না। বেশিরভাগ সময় দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। এই কদিন দাড়ি-গোঁফ না কামানোয় সমস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কুৎসিত একটা অবস্থা। এদিকে বাবা আবার বিছানায় পড়ে গেছেন। দিনে কুড়িবার করে তাঁকে বাথরুমে যেতে হচ্ছে। কয়েক গ্যালন স্যালাইন ওয়াটার খেয়ে তাঁর কিছু হচ্ছে না।

এতসব ঝামেলার মধ্যে কমলা আবার ছাদে ভূত দেখে দাঁত কপাটি লেগে পড়ে গেল। ভূতটা নাকি শূন্যে হাঁটছিল। কমলাকে দেখেই লম্বা কালো হাত বাড়িয়ে বলল,

এই কমলা, তোকে ছুঁয়ে দিলাম। কমলার এই ভূতের কথা কেউ বিশ্বাস করছেনা, তবে সবাই ভয়ে আধমরা। মীরাইরা সামান্য শব্দেই চেঁচিয়ে উঠছে। মাকে ঘুমুতে হচ্ছে মীরা-ইরার সঙ্গে। অথচ তাঁর খুব ইচ্ছা তিনি অসুস্থ বাবার সঙ্গে থাকেন। তা সম্ভব হচ্ছে না।

গতকাল রাতে আমাকে এসে বললেন, ও টুকু, তুই তোর বাবার সঙ্গে ঘুমুবি?

আমি হেসে ফেললাম।

মা দুঃখিত গলায় বললেন, হাসছিস কেন? হাসির কথা বলেছি?

হুঁ বলেছ।

বাবার সাথে ছেলেরা ঘুমায় না?

দশ বছরের নিচের ছেলেরা হয়ত ঘুমায়। চব্বিশ পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলেরা ঘুমায় না।

ঘুমুলে অসুবিধা কী?

ঘুমুলে দুজনেরই ক্ষতি হয়। দুজনেরই অহংবোধে আঘাত লাগে। ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়। শুরুটা চেইন রিএ্যাকশনের মতো। একবার শুরু হলে অতি দ্রুত এক্সপ্লোসিভ লিমিটে পৌঁছে যায়। তুমি বুঝবে না।

মা চুপ করে গেলেন।

কিছু কঠিন কঠিন শব্দ এদিক-ওদিক করে বললেই মা চুপ করে যান। ক্ষীণ স্বরে মাঝে মাঝে বলেন, কথা বলার সময় তো বড় বড় কথা, এদিকে পরীক্ষায় তো গোল্লা খাস।

আজ সে রকম কিছু বললেন না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

৪. ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল

ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল।

ছোট চাচা এক দুপুরে বাসায় এসে মীরাকে বললেন, মীরা, আমি সমিতাকে আজ বিয়ে করেছি। তুই খবরটা তোর চাচীকে দিয়ে আয়। সমিতা তিনটার দিকে আসবে।

মীরা পানির গ্লাস নিয়ে যাচ্ছিল। অবিকল সিনেমার দৃশ্যের মতো এই কথা শুনে তার হাত থেকে পানির গ্লাস পড়ে গেল।

ছোট চাচা ইংরেজিতে বললেন, আমাদের একটাই মাত্র জীবন। এই এক জীবনে আমাদের অধিকাংশ সাধই অপূর্ণ থাকে। আমি তা হতে দিতে চাই না। যা পাই হাত পেতে নেব। তুই তোর চাচীকে খবরটা দিয়ে আয়। যাবার আগে ভাঙা গ্লাসের টুকরাগুলো ফেলে দিয়ে যা। পা কাটবে।

মীরা তার কিছুই করল না। দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল। তার কিছুক্ষণ পরই কমলা ভাঙা গ্লাসের টুকরায় তার পা কেটে রক্তারক্তি করল।

এইসব খবর আমি অবশ্যি জানলাম অনেক পরে। ঐদিন কী মনে করে যেন ক্লাস করতে গিয়েছিলাম। এ. কে. বদরুদ্দোজা নামের নতুন এক জন স্যার আইনের ভাষ্য বলে খানিকক্ষণ বিজবিজ করে কিছু বলতেই হৈচৈ বেধে গেল। পেছনের এক জন উঁচু গলায় বলল, আইন, গাইন। সারা ক্লাস জুড়ে হাসি। হাসি থামতেই ক্লাসের শেষ প্রান্ত থেকে অন্য আরেকজন বলল, আইন, গাইন, ফে, কাফ, কাফ। নতুন স্যার পুরোপুরি হতভম্ব। এই

অবস্থা তিনি কল্পনাও করেন নি। স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, ইউ, ইউ, উঠে দাঁড়াও। কী শুরু করেছ?

আমি উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু কিছুই বললাম না। ভদ্রলোক যে পরিমাণ রেগে আছেন—তাঁকে কিছু বলতে যাওয়া অর্থহীন।

কেন তুমি আইন, গাইন করছ? কেন?

আমার পেছন থেকে এক জন বলল, স্যার, ও মাদ্রাসা থেকে পাস করেছে।

আবার চারদিকে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। গম্ভীর স্বরে অন্য এক জন খুব দরদ দিয়ে শুরু করল, আইন গাইন ফে কাফ কাফ। আলিফ জবর আ, বেজবর বা।

ক্লাস ডিসমিস হয়ে গেল। নতুন স্যার আমাকে বললেন, তুমি আস আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে বের হয়ে এলাম। ক্লাস থেকে বের হওয়ামাত্র তিনি বললেন, তোমাকে পঁচিশ টাকা ফাইন করা হল। আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

চল আমার সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ইউ র্যাসকেল। কত ধানে কত চাল তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আমি আবারো বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল স্যারের ঘরে আমাকে ঘন্টাখানিক দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন আমি নিরীহ টাইপ কেউ, না কি কোন ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যখন নিঃসন্দেহ

হলেন আমি নিরীহ ধরনের এক জন, তখন বললেন, তোমাকে আমি এক্সপেল করছি। ক্যান্সার সেল আমি রাখব না। আমি আবারো বিনীত গলায় বললাম, জ্বি আচ্ছা স্যার।

স্যারের কাছে আমার নাম রোল নাম্বার লিখে দিয়ে বাসায় এসে দেখি বিরাট নাটক। ছোট চাচা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। বিয়ে হয়ে গেছে। একটা সুটকেস হাতে সমিতা উঠে এসেছে বাড়িতে। তার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটি তার আগের পক্ষের স্বামীর। যে স্বামী আট বছর আগে মারা গেছেন।

নাটকের মূল অংশটি হচ্ছে ভেতরের বাড়িতে। বসার ঘরে দুটি সুটকেসের পাশে ছোট মেয়েটি বসে আছে। আমি খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা গেল না।

ছোট চাচী ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। দরজা খুলছেন না। মীরাইরা দুজনেই বন্ধ দরজার সামনে কান্নাকাটি করছে এবং বারবার বলছে, দরজা খুলুন চাচী, দরজা খুলুন। প্লিজ, প্লিজ।

দ্বিতীয় মিটিং চলছে ছোট চাচা এবং বড় চাচার মধ্যে। সেখানেও ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ইংরেজিতে।

সমিতা বসে আছে খাবার ঘরের টেবিলে। মা ঠিক তার মুখোমুখি। এই দুজন কোনো কথা বলছেন না। মা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সেই দৃষ্টিতে রাগ বা ঘৃণা খুব নেই, আছে বিস্ময়।

আমি বসার ঘরে বাচ্চা মেয়েটির কাছে চলে এলাম। নরম গলায় বললাম, কেমন আছ খুকি?

সে ঠিক বড়দের মতো আবেগহীন গলায় বলল, ভালো।

নাম কি তোমার?

মিস লরেটা গোমেজ।

মিস?

হ্যাঁ। বিয়ে হয় নি তো, তাই মিস।

বাচ্চা মেয়েটির কথায় চমৎকৃত হলাম। বাচ্চারা বড়দের সহজেই চমকে দিতে পারে। বড়রা তা পারে না। বড়দের কাণ্ডকারখানায় শিশুরা চমকায় না। আমার মনে হল, এই মেয়ে তার মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ এবং এই বাড়িতে উঠে আসার পুরো ব্যাপারটাই বেশ সহজে মেনে নিয়েছে।

খুকি, তুমি কি এই বাড়িতে থাকবে?

তা ছাড়া কোথায় থাকবো?

কোন ক্লাসে পড় তুমি?

ক্লাস থ্রি।

বাহ্, তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, তুমি থ্রিতে পড়। মনে হয় ওয়ান কিংবা টু।

মিস লরেটা গোমেজ গম্ভীর গলায় বলল, জানেন, আমি কিন্তু সব ক্লাসে ফার্স্ট হই।

চমৎকার।

বিড়ালের বাচ্চার ইংরেজি কি আপনি বলতে পারেন?

মানুষের বাচ্চার ইংরেজিই জানি না, আবার বিড়ালের বাছা! তুমি জান না কি?

জানি। কিটেন। হাতির বাচ্চার ইংরেজি কি তুমি জান?

মেয়েটা অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে থেকে বলল, হাতির বাচ্চার কোনো ইংরেজি হয় না।

গভীর মমতায় আমার চোখ ছল ছল করতে লাগল। এই বাড়িতে কত-না দুঃসময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। বড়দের তৈরি করা নাটকে তার অভিনয় করতে হবে। ইচ্ছা না থাকলেও করতে হবে।

মিস লরেটা গোমেজ, আমি তোমার সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্প করি?

আপনার ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

আমি তার মুখোমুখি বসলাম। এই প্রথম কালো রোগা বড় বড় চোখের মেয়েটি হাসল। তার হাসির একটাই মানে আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম।

সে পা নাচাতে নাচাতে বলল, আচ্ছা বলুন তো, দুটো স্যুটকেসের মধ্যে কোনটা আমার?

সবচে বড়টা।

সে চমকে উঠে বলল, ঠিক বলেছেন। কী করে বললেন?

আমি সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, এক কাজ করলে কেমন হয় লরেটা, বাসায় এখন ঝগড়া চলতে থাকবে। বড়দের ঝগড়া করার সুযোগ দিয়ে আমরা দুজন চল আইসক্রিম খেয়ে আসি।

চলুন।

তুমি কি তোমার মাকে বলে যাবে?

না।

সে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল।

বাড়িতে হৈচৈ চলতেই থাকল।

ছোট চাচীর বাবা গোলাপপ্রেমিক জাজ সাহেব রাত নটার দিকে চলে এলেন। জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। তিনি বসার ঘরে বসে ঘন ঘন অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে লাগলেন। কোত্থেকে সেই সন্ন্যাসী ব্যাটাও জুটেছে। সে গভীর আগ্রহে এই অগ্নিকাণ্ড দেখছে। অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েও ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না, কারণ, দেখার কেউ নেই। শুধু আমি এবং সন্ন্যাসী বসে, আর কেউ নেই।

সন্ন্যাসী এর মধ্যে এক কাণ্ড করল-জাজ সাহেবকে বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না, আপনার কাছে দেয়াশলাই থাকলে একটা কাঠি দিন। কান চুলকাব।

হু আর ইউ?

আমি স্যার কেউ না, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

এইখানে কী চান?

বললাম না, আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, কারো কাছে আমার কিছু চাইবার নেই। আপনি স্যার এইভাবে চিৎকার করবেন না। এরকম রাগারাগিতে অনেক সময় হার্ট এ্যাটাক হয়।

শাট আপ।

জ্বি আচ্ছা স্যার। আপনার কাছে তাহলে দেয়াশলাই নেই?

শাট আপ।

অতি উত্তপ্ত আবহাওয়া রাত এগারটার দিকে হঠাৎ করে খানিকটা পড়ে গেল। বড় চাচা এসে জাজ সাহেবকে কী যেন বললেন, তিনি বাড়ি চলে গেলেন। ছোট চাচী ঘরের গরজা খুলে বের হয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল না খুব আপসেট।

আমার কাছে একমাত্র বাবাকেই অসম্ভব আপসেট মনে হল। তিনি, মনে হল, কান্নাকাটিও করেছেন, তাঁর চোখ লাল। আমাকে এসে বললেন, কেউ তো সারাদিন কিছু খায় নি। টুকু, তুই কোনো হোটেল থেকে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আয়।

এত রাতে কিছু পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। পাওয়া গেলেও কেউ কিছু খাবে বলে মনে হয় না। খিদে লাগলে পাউরুটি-বিসকিট আছে, ঐ খেয়ে শুয়ে পড়বে।

আচ্ছা তাহলে থাক।

আমি সিগারেট প্যাকেট খুলে দেখি পাঁচটা সিগারেট। ঠিক করলাম, আজকের এই বিশেষ রাতটা মনে রাখবার জন্য পর পর পাঁচটা সিগারেট খাব। মাথা যখন ঝিমঝিম করতে থাকবে তখন বিছানায় শুয়ে পড়ব।

সবে দুটা সিগারেট শেষ করেছি, ছোট চাচা লরেটাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, এই মেয়েটাকে শোয়াবার জায়গা পাচ্ছি না। তোর কাছে রাখবি?

রাখব।

এক্সট্রা বালিশ আছে তোর ঘরে?

লরেটা বলল, আমার বালিশ লাগবে না।

আমি মেয়েটাকে আমার পাশে শুইয়ে দিলাম। এত রাত হয়েছে তব তার চোখে। ঘুম নেই। সে চোখ বড় বড় করে শুয়ে আছে। এক সময় বলল, আমি আপনাকে কী ডাকব?

টুকু ডাকবে। আমার নাম টুকু।

বড়দের বুঝি নাম ধরে ডাকা যায়?

বড় হলেও আমি তোমার বন্ধু। বন্ধুকে নাম ধরে ডাকা যায়। নিয়ম আছে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, টুকু, তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। ঘুম আসছে না।

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। বাতি নিভিয়ে দিলাম। এই শিশুটির চোখের জল আমি দেখতে চাই না।

পরদিন ভোরে ছোট চাচী জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা উকিল নোটিস চলে এল। সেই নোটসে কী লেখা আমরা জানলাম না, কারণ, উকিল নোটিস ছোট চাচা কাউকে পড়তে দিলেন না।

রাতে বড় চাচা আমেরিকায় টেলিফোন করলেন। টেলিফোনে বড় চাচীকে বলা হল তিনি যেন এক্ষুনি চলে আসেন। জানা গেল চাচী আসছেন। বড় চাচা এমন ভঙ্গি করতে লাগলেন যেন চাচী আসামাত্র সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অথচ বড় চাচী কখনো কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। বরং তাঁর দীর্ঘ জীবনে নানান সমস্যা তৈরি করেছেন। এই যে দিনের পর দিন বাইরে পড়ে আছেন এ-ও কি এক সমস্যা নয়?

বিদেশের জলবায়ুতে মেদ বৃদ্ধির কোনো উপাদান আছে। বড় চাচী যতবার বিদেশ থেকে আসেন ততবারই দশ থেকে বারো কেজি বাড়তি মেদ নিয়ে আসেন।

এবার একেবারে গোলআলু হয়ে ফিরলেন। রং আগের চেয়ে অনেক ফর্সা, মাথার চুল কুচকুচে কালো। চুলের রঙে কলপের একটা অবদান বোঝা যাচ্ছে, তবে গায়ের রঙের রহস্যাটা কি, কে জানে।

আমাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বললেন, আর লোকজন কোথায়? আর কেউ এয়ারপোর্টে আসে নি?

আমি বললাম, না।

বড় চাচী অবাক হয়ে বললেন, সে কি! তোর বড় চাচাও আসে নি?

না।

এর মানেটা কি? এত দিন পর আসছি আর এয়ারপোর্টে কেউ নেই। আমি কি ফেলনা?

ফেলনা হবেন কেন? আপনার লাগেজপত্র কি এই, না আরো আছে?

বড় চাচী লাগেজের খোঁজে গেলেন। তিনি নাকি মিডিয়াম সাইজের একটা সুটকেস না নিয়েই চলে এসেছেন। কাস্টমস-এর লোকজনদের সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়া শুরু করলেন। তারা বড় চাচীকে আবার ভেতরে ঢুকতে দেবে না, বড় চাচীও ঢুকবেনই। আমি শুনছি তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, কোন আইনে আছে যে, একবার বেরিয়ে পড়লে আবার ঢোকা যাবে না? দেখুন, আমাকে রুলস শেখাবেন না। এসব আমার জানা আছে।

আমি চমৎকৃত হলাম। কারণ বড় চাচী যে সব জিনিস চমৎকার জানেন, তা হচ্ছে কী করে লাউ ফুলের বড়া বানাতে হয়, সাজনা গাছের কচিপাতার তরকারি কী করে রাঁধতে হয়, কৈ মাছের পাতুরিতে পেঁয়াজ কাটা দিতে হয় কি দিতে হয় না। তিনি যে কাস্টমস-এর আইন-কানুনও জানেন, তা জানা ছিল না।

টার্মিনাল থেকে বের হয়ে বললেন, গাড়ি কোথায়? আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, গাড়ি নেই। চলুন বেবিট্যাক্সি নিয়ে নেই। চাচী থমথমে গলায় বললেন, গাড়িও পাঠাল না। এর মানে কি বল তো? এর মানেটা কি?

বাড়িতে নানা ঝামেলা।

ঝামেলার কথা কি আমি জানি না? ঠিকই জানি। আধঘন্টার জন্যে এলে বাড়ি ধ্বংস হয়ে যেত? বল তুই, কী হত আধঘণ্টার জন্যে এলে?

আমি তাঁকে খুশি করবার জন্যে একটা বিকল্প ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেললাম। চাচী মুখ কালো করে ট্যাক্সিতে উঠলেন। আমাকে বললেন, তুই ড্রাইভারের সঙ্গে গিয়ে বোস। তোর গা দিয়ে সিগারেটের গন্ধ বেরুচ্ছে। অন্য কেউ হলে এ কথায় অপমানিতবোধ করত, আমি করলাম না। বড় চাচী এ ধরনের কথা সব সময় বলেন।

তুই এখন করছিস কী?

কিছু না, ল পড়ছি।

ল একটা পড়ার জিনিস হল? খামাকা এটা পড়ছিস কেন? তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কোন কালে হল না। দাড়িও তো দেখি ঠিকমতো শেভ হয় নি। খোঁচা খোঁচা বের হয়ে আছে।

আমি মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। চাচী খুব যন্ত্রণা করেন। সারাক্ষণ কথা বলেন। এমন সব কথা যা হজম করা বেশ কঠিন। তাঁর মেয়েরা এবং মেয়ের জামাইরা তাকে কী করে সহ্য করেন কে জানে।

ও টুকু।

জ্বি।

তোর জন্যে একটা বাইনোকুলার পছন্দ করেছিলাম। ষাট ডলার দাম। প্যাকেট করে কাউন্টারে গিয়ে দেখি বাইনোকুলারটা কাচে ফাংগাস। আর কেনা হল না।

বাইনোকুলার দিয়ে আমি কী করব? না কিনে ভালোই করেছেন। ঐ সবের আমার দরকার নেই।

দরকার থাকবে না কেন? ক্রিকেট খেলাটেলা হলে দূর থেকে দেখবি। পরের বার আসবার সময় নিয়ে আসব, তখন দেখবি কত চমৎকার।

আচ্ছা নিয়ে আসবেন।

মীরা আর ইরার জন্য দুসেট কসমেটিক কিনেছিলাম, এভন কোম্পানির। তাড়াহুড়ার মধ্যে মেয়ের বাসায় ফেলে এসেছি। এখন এমন খারাপ লাগছে। মেয়েগুলোর জন্যে কখনো কিছু আনা হয় না। আশা করে থাকে।

এসব হচ্ছে তাঁর কথার কথা। আমেরিকা থেকে আসার পর প্রথম কিছুদিন যার সঙ্গেই দেখা হবে, তাকেই তিনি এরকম কিছু বলবেন। তাঁর এই স্বভাব নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করা হয়। তিনি তা বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণা, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। বুদ্ধি দিয়ে তিনি সব ম্যানেজ করতে পারেন।

ও টুকু।

জ্বি।

বাড়ির অবস্থা কি বল।

গেলেই দেখবেন।

সে তো দেখবই। বলতে অসুবিধা আছে? তোর ছোট চাচা কি মেয়েটাকে বাড়িতে এনে তুলেছে?

হ্যাঁ।

বলিস কী।

ছোট চাচী অর্থাৎ এক্স ছোট চাচী কোর্টে কেইস করে দিয়েছেন, মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন, সম্মানহানি এইসব কী যেন। ভালো ভালো উকিলও দেয়া হয়েছে। আমাদের অবস্থা কেরোসিন বলতে পারেন। ক্রমাগত কোর্টে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।

চাচী এতবড় খবর শোনার পরও কোন শব্দ করলেন না। পেছনে ফিরে দেখি, তিনি সিটে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরালাম। গাড়ি বড় বড় কয়েকটা ঝাঁকুনি খেল। চাচীর ঘুমের তাতে উনিশ বিশ হল না। মোটা মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়লে সহজে জাগে না। শরীরের মতো এদের ঘুমও ভারী হয়।

বড় চাচীকে নিয়ে আমি পৌঁছলাম খুব খারাপ সময়ে। ঐ সন্ন্যাসী ব্যাটা ভোলাবাবু তখনই কী জন্যে যেন এসেছে, বড় চাচা গলা ফুলিয়ে তাকিয়ে তাকে ধমকাচ্ছেন। সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসীসুলভ নির্লিপ্ততায় ঐসব ধমক হাসিমুখে সহ্য করছে। বড় চাচা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলছেন, ইউ আর এ ফ্রড নাম্বার ওয়ান। এ থিফ। খবদার, এখানে আর আসবি না।

সন্যাসী বলছে, রাগারাগি করাটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে মঙ্গলজনক হবে না। তাছাড়া তুই-তোকারি ভালো শুনাচ্ছে না, সবার মুখে তো সবকিছু মানায় না।

বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

যাচ্ছি, আপনি দয়া করে এত উত্তেজিত হবেন না।

আবার কথা বলে।

আপনি বলেন বলেই বলি। আপনি না বললে বলতাম না। ধ্বনি হলেই প্রতিধ্বনি হয়।

খবর্দার ব্যাটা, বড় বড় কথা বলবি না। বড় বড় কথা তোরচে আমি বেশি বলতে পারি।

সে তো খুবই আনন্দের কথা। আপনি বলুন, আমি শুনি।

তোকে ধরে একটা আছাড় দেব ব্যাটা ফ্রড।

আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। আমার ওজন অনেক।

চুপ! চুপ।

আপনি চুপ করলেই চুপ করব। আমি আগেই বলেছি ধ্বনি হলেই প্রতিধ্বনি হবে।

চুপ! চুপ।

কথোপকথনের পুরো অংশটি আমরা বসার ঘরে ঢোকার আগে আগে শুনলাম, চাচী হতভম্ব গলায় বললেন, তোর চাচা কার সঙ্গে এরকম চেঁচামেচি করছে? লোকটা কে?

লোকটা এক জন সন্ন্যাসী-নাম ভোলাবাবু।

তোর চাচা সন্ন্যাসী নিয়ে কী করছে? হচ্ছে কী এসব? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না।

চাচী চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন এবং বড় চাচাকে বললেন, এই, তুমি চেচা কেন?

বড় চাচা গলা আরো চড়িয়ে বললেন, তুমি ভেতরে যাও। চাচী আরো হকচকিয়ে গেলেন। তিনি আহত গলায় বললেন, তুমি ঝগড়া করছ কেন?

চাচা থমথমে গলায় বললেন, ভূত দেখাবার নাম করে ব্যাটা সারারাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে। এখন বড় বড় কথা বলে। আমি এত সহজে ছাড়ার লোক না। স্ক্রু কী ভাবে টাইট দিতে হয়, আমি জানি। আমাকে ব্লাফ দেয়, কত বড় সাহস!

চাচী বললেন, ভূত দেখাবার কথা তুমি কী বলছ? ভূত দেখা মানে? ভূত দেখা যায় না কি?

কি মুশকিল। ভেতরে যেতে বললাম না? কানে শুনতে পাও না!

চাচী আহত এবং অপমানিত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অন্যবারের মতো এবার আর তাঁকে দেখে কেউ ছুটে এল না। মীরা-ইরা এসে জড়িয়ে ধরল না। চাচী বললেন, বাসায় কেউ নাই নাকি?

আমি বললাম, থাকার তো কথা। সবাই বোধহয় দোতলায় আছে। চলুন দোতলায় চলে যাই।

আমি এখন সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। তুই সবাইকে ডেকে আন। আর তোর বড় চাচাকেও আসতে বল....। চাচীর কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়ি দিয়ে সমিতাকে নামতে দেখা গেল। তার পিছু পিছু নামলেন ছোট চাচা। তিনি সিঁড়ি থেকে বললেন, ভাবী, ভালো আছেন? খুব একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি, পরে আপনার সাথে কথা বলব।

চাচী অবাক হয়ে সমিতার দিকে তাকিয়ে আছেন। তারা চলে যাবার পর তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, এই কি সেই মেয়ে?

হ্যাঁ।

কদিন হল এ বাড়িতে আছে?

দিন সাতেক।

লজ্জা-শরম দেখি মেয়েটার একেবারেই নেই। এই বাড়িতে এসে উঠল?

স্বামীর বাড়িতে উঠতে অসুবিধা কি? স্বামীর বাড়িতে উঠতে লজ্জা নেই।

স্বামীর বাড়ি? স্বামীর বাড়ি মানে? বিয়ে হয়েছে নাকি? বিয়ের কথা তো কেউ কিছু লিখে নি।

অনেক কিছুই কেউ আপনাকে জানায় নি। এখন জানবেন।

আমি দোতলায় লোকজনের খোঁজে গেলাম। কাউকে পেলাম না। মীরা গেছে তার কোন ক্লাসফ্রেন্ডের কাছ থেকে নোট আনতে। ইরা গেছে তার সঙ্গে। বড় চাচীর মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কাঁদে কাঁদো গলায় বললেন, সবাই জানে আজ আমি আসছি। তারপরও কেউ বাসায় নেই। এ বাড়িতে হচ্ছে কী? আমি সহজ স্বরে বললাম, অনেক দিন আপনি এ বাড়িতে থাকেন না, কাজেই এ বাড়ির নিয়ম-কানুন এখন কী তা জানেন না। জানলে এত অবাক হতেন না। হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি চা দিতে বলি।

আগে তুই তোর বড় চাচাকে ডেকে আন। এক্ষুনি আন। বলবি খুব জরুরি।

তাঁকে পাওয়া গেল না। জানা গেল সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর সঙ্গে বের হয়ে গেছেন। এতদিন পর স্ত্রী বাইরে থেকে ফিরেছে অথচ তিনি একটা মুখের কথা বলার জন্যেও ভেতরে আসেন নি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সত্যি সত্যি বড় চাচীর চোখে পানি এসে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, তোরা সব ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করছিস, তাই না? কী কী করবি সব আগে থেকে ঠিক করা। যুক্তি করে মীরাইরা বাইরে চলে গেছে। একটা লোককে সন্ন্যাসী সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছিস যাতে আমি ঘরে ঢোকামাত্র তোরা একটা ঝগড়া শুরু করতে পারিস। তার চাচাও আমার সঙ্গে কথা না বলে বের হয়ে গেল। আমি বোকা, তবে এটা না বোঝার মতো বোকা আমি নই।

তিনি প্রায় শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। দেশ-বিদেশ ঘুরলেও বাঙালি মেয়েরা ঠিক আধুনিক কখননী হয়ে উঠতে পারে না। কাঁদার সামান্য সুযোগ পেলেও তা গ্রহণ করে। চাচী ৰাইরের কাপড় না বদলেই উপরে গিয়ে শুয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে অস্ফুট গলায় বলতে লাগলেন, কী হচ্ছে? এ বাড়িতে এসব কী হচ্ছে?

এ বাড়িতে কী যে হচ্ছে, তা তিনি পুরোপুরি জানলেন সন্ধ্যার পর পারিবারিক বৈঠকে। তিনি জানলেন যে, এ বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে ছোট চাচী উকিল নোটিস পাঠিয়েছেন। কারণ বাড়িটা তাঁর নামে দলিলপত্র করা। তিনি আরো জানলেন যে, টেলিফোনে ছট চাচাকে নানান ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে। ছোট চাচীর বাবা জাজ সাহেব কিছু গুণ্ডাপাণ্ডাও লাগিয়েছেন যারা একদুপুরে ছোট চাচার গাড়ির কাচ ভেঙে দিয়ে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় দুজন শুটকো মত লোক ছোট চাচার চেম্বারে ঢুকে বলে গেছে, এই যে চোখের ডাক্তার, চোখ দুটো গেলে দিলে কেমন লাগবে, বলেন দেখি? একদিন এসে দুটো চোখ গেলে দিয়ে যাব।

জাজ সাহেবের মতো গোলাপপ্রেমিক লোক এরকম গুণ্ডা লাগাবেন, তা ভাবা যায় না। তবে তিনি যে লাগিয়েছেন তা বোঝা গেল মঙ্গলবার রাত নটার দিকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটল আমার চোখের সামনে। আমি বাড়ির সামনের ফুটপাতে সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, হঠাৎ দেখি রোগা একটা ছেলে মোটর বাইক নিয়ে গেটের কাছে এল। এক পলকের জন্যে থেমে ঝড়ের বেগে বাইক নিয়ে চলে গেল, পর মুহূর্তেই বিকট আওয়াজ। তখনো বুঝতে পারে নি যে, এই মোটর বাইকওয়ালা ছেলেটা একটা বোমা ফাটিয়ে গেছে। এই বোমায় আমাদের কারোর কিছু হল না—ছোট চাচার গাড়ির ড্রাইভার কুদ্দুসের বাঁ পা উড়ে গেল। কুদ্দুস এমন অবস্থায়ও জ্ঞান হারাল না। শীতল গলায় বলল,

ভাইজান, আমারে হাসপাতালে নেন। হাসপাতালেও কুদ্দেসর জ্ঞান বজায় রইল। অথচ বড় চাচী সেই যে বোমার শব্দে জ্ঞান হারালেন তা ফিরে পেলেন পরদিন ভোর ছটায়। জ্ঞান পাবার পর জানতে পারলেন কুদ্দুস মারা গেছে।

আমরা বড় সমস্যায় পড়ে গেলাম। কুদ্দেসর আত্মীয়স্বজনের কারোর কোনো ঠিকানা আমরা জানি না। কুদ্দস একবার বলেছিল, তার দেশ চাঁদপুর। সে প্রতি দুমাস পর তিন দিনের ছুটিতে চাঁদপুরে যায়, সঙ্গে ছোট ছোট শার্ট-প্যান্ট থাকে। এই শার্টপ্যান্ট কি তার ছেলেদের জন্যে? কত বড় তারা—আমরা তার কিছুই জানি না।

কুদ্দুস যে ঘরে থাকতো, সেখানে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। এক জন মানুষ কোনো রকম ঠিকানা না রেখে ঠিকানাবিহীন এক দেশের দিকে রওনা হল।

কুদ্দুসের ডেডবডি নিয়ে আমরা মহাযন্ত্রণায় পড়লাম। সাধারণ মৃত্যুতেই অনেক সমস্যা, অপঘাতে মৃত্যু মানে—অতলান্তিক সমুদ্র। পোস্টমর্টেম হবে, পুলিশী তদন্ত হবে, কেইস ফাইল হবে, পত্রিকার লোকজনও নিশ্চয়ই আসবে। এই জাতীয় মৃত্যুগুলো সম্পর্কে পত্রিকাওয়ালাদের আগ্রহ সীমাহীন। হত্যা, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ভেতরকার কথা, ঘাতক বোমা, পুলিশ নীরব।

এই রকম কোনো মৃত্যু ঘটা মানে জলের মতো টাকা যাওয়া। সবাইকে টাকা খাওয়াতে হয়। পান খাবার জন্যে সবাই কিছু-না-কিছু পাবে। এখন কথা হচ্ছে কুদ্দেসর জন্য এত ঝামেলা আমরা করব, কি করব না। তবে টাকাওয়ালা মানুষের জন্যে কোনো ঝামেলাই ঝামেলা না। আমরা নাসিমুদ্দিন নামে আমাদের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়কে খবর দিলাম।

তিনি অফিস ফেলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন। মুখভর্তি পান। হাসি হাসি ভাব। যেন এই ঝালেমায় খুব আনন্দ পাচ্ছেন।

এই জাতীয় চরিত্রের সংখ্যা আমাদের সমাজে প্রচুর। এঁরা হচ্ছেন সমস্যা-বিশারদ। বিস্তর লোকজনকে তাঁরা চেনেন। কার কাছে গেলে কোন কাজটা হয়, তা এঁদের নখদর্পণে। পুলিশের লোক, মন্ত্রীর পি. এ.-দের সঙ্গেও তাঁদের মাখামাখি থাকে। চব্বিশ ঘন্টার নোটিসে এরা পাসপোর্ট বের করতে পারেন। কেউ হয়ত বিদেশ থেকে প্রচুর মালামাল নিয়ে আসছে, তাঁকে খবর দিলে তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন যে, কাস্টমসের লোকজন ব্যাগ না খুলেই চক দিয়ে ক্রসচিহ্ন দিয়ে দেবে। হাউস বিল্ডিং-এর লোন কী করে পেতে হয় তাও তাঁরা খুব ভালো করে জানেন।

নাসিমুদ্দিন মামা ঘরে পা দিয়েই বললেন, চিন্তার কিছু দেখছি না। আগে চা নিয়ে আস, চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি টেলিফোন ঠিক আছে? গোটাদশেক টেলিফোন করতে হবে।

আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর ভয় নেই, এবার ব্যবস্থা হবেই। নাসিমুদ্দিন মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, হাজার তিনেক টাকার ব্যবস্থা করেন, ছোট নোট। এর আত্মীয়স্বজনের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে?

বাবা বললেন, না। চায়ের দোকানের এক ছেলে বলল, কুমিল্লানবীনগরে বাড়ি। আগে শুনেছিলাম চাঁদপুর।

লোকাল কাউকে খুজে বের করতে হবে। এই লাশ নবীনগরে কে নিয়ে যাবে? দেখি কোনো খোঁজ করতে পারি কি-না। চায়ের দোকান, সিগারেটের দোকান এইসব জায়গায় খোঁজ করতে হবে। আশপাশের লন্ড্রিতে পাত্তা লাগাতে হবে। দেখি কী করা যায়।

নাসিমুদ্দিন মামা অসাধ্য সাধন করলেন। খোঁজ বের করলেন, এসি দাস রোডের এক মেসে কুদ্দুসের চাচাতো ভাই থাকে। সেও ড্রাইভার। ট্রাক চালায়। ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা—আমাকে বলা হল কুদ্দুসের ভাইয়ের সন্ধানে যেতে।

সিনেমাতে ডাকাতদলের গোপন আড়া যে রকম থাকে, সেটা অবিকল সে রকম। পয়সা দিয়ে তাস খেলা হচ্ছে। বিড়ির উৎকট গন্ধে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। তারা দুপুরের খাবার শেষ করে তা নিয়ে বসেছে। ময়লা থালাবাসন উঠিয়ে নেওয়া হয় নি। বড় বড় নীল মাছি ভভ করছে। তাস খেলোয়াড়রা আমার দিকে খুবই সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল। কুদ্দুসের ভাইটির কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, কী জন্যে দরকার?

দরকারের বিষয়টা ভেঙে বলার পরও সন্দেহ যায় না। একজন জিজ্ঞেস করল, ভাইজান, আফনে কী করেন? ছাত্র শোনার পর তার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কুদ্দুসের ভাই এখানে থাকে কী থাকে না, এটা বলতে অসুবিধা আছে?

থাকে। এইখানেই থাকে।

এখন কোথায়?

ট্রিপে গেছে।

কোথায় গেছে? কখন আসবে?

তা তো ভাইজান বলতে পারি না। গেছে বগুড়া। আরিচাঘাটে আটকা পড়লে সাত দিনের মামলা। আর আটকা না পড়লে ধরেন তিনদিন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে বের হয়ে এলাম। দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এখন আর কেউ বলতে পারবেনা—আমরা খোঁজ-খবর করি নি। কুদ্দেসের আত্মীয়স্বজন কেউ এলে বলা যাবে যে, চেষ্টার ত্রুটি হয় নি।

বাসায় ফিরে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ছোট চাচীর বাবা গোলাপপ্রেমিক জাজ সাহেব এসেছেন। তাঁকে খাতির করে চা দেয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বড় চাচা এবং বড় চাচী আছেন। কথা বলছেন নিচু গলায়। তাদের চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ আন্তরিক আলাপ হচ্ছে। এরকম তো হবার কথা না। রহস্যটা কি?

মাকে গিয়ে বললাম, ব্যাপার কিছু জান মা? মিলমিশ হয়ে গেছে না-কি?

মা বললেন, বুঝতে পারছি না। শুনলাম তোর ছোট চাচা নাকী ঐ বাড়িতে টেলিফোন করেছিল।

কখন?

দুপুরে। জাজ সাহেব টেলিফোন পেয়েই এসেছেন।

ছোট চাচা কোথায়?

জানি না।

আমাদের নার্স চাচী? সেও নেই।

দুজনের কেউ নেই।

দুপুরে বাড়িতে কিছু রান্না হয় নি। মরা-বাড়িতে আগুন ধরাতে নেই, এরকম একটা নিয়ম না-কি আছে। হোটেল থেকে আনা খাবার সবাই খেয়েছে। শুধু বড় চাচী খান নি। চোখের সামনে একটা ডেডবডি নিয়ে তিনি সলিড কিছু খেতে পারবেন না। একটা পেপসি এনে খেয়েছেন। সেই পেপসিও বমি করে ফেলে দিয়েছেন।

ডেডবডি রাখা হয়েছে কুদ্দেসর ঘরে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। একটা বড় প্যাকিং বক্সে বরফ দিয়ে রাখা হয়েছে। সেই বরফ গলে পানি চুইয়ে আসছে। বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেপুলেদের ভিড়। পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর চোখে সানগ্লাস। এই ভদ্রলোক কথা বলছেন বাবার সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে সবাই মোটামুটি মধুর স্বরে কথা বলে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় অতি বুদ্ধিমান লোকের মুখেও বোকা-বোকা একটা ভাব চলে আসে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বাবার মধ্যে তা দেখলাম না, বরং মনে হল তিনি ঝগড়ার সুরে কথা বলছেন।

আপনাদের এইসব নিয়ম-কানুনের মানেটা কী দয়া করে বলুন তো? চাক্ষুষ সাক্ষী-প্রমাণ আছে, বোমা ফেটে লোকটা মারা গেছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ডাক্তাররা ডেথ

সার্টিফিকেটেও এই কথা লিখে দিয়েছেন। এরপর আবার পোস্টমর্টেম কী? এতগুলো মানুষের সাক্ষী-প্রমাণ আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না?

জ্বি না। আপনারা মিথ্যা বলতে পারেন।

নাড়িভুঁড়ি কেটে ডাক্তার যা বলবে, সেটাই সত্যি? ঐ ডাক্তার মিথ্যা বলতে পারে না?

অবশ্যই পারেন। মাঝে মাঝে তাঁরাও মিথ্যা বলেন। তবু নিয়ম বলে একটা কথা।

এইসব নিয়ম তুলে দেন না কেন?

নিয়মগুলো ভালো, মানুষ হচ্ছে খারাপ। মানুষ ভালো হলে এইসব নিয়মকানুনের দরকার ছিল না।

শেষ পর্যন্ত পোস্টমর্টেম করাতে হল না। নাসিমুদ্দিন মামা সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে হাসিমুখে বাড়িতে ঢুকে বললেন, আরো তিনশ কুড়ি টাকা দরকার। নিজের পকেট থেকে চলে গেছে। এখন কবর কোথায় হবে সেটা বলেন, এইখানেও টাকার ব্যাপার আছে।

সমস্ত দিন আমার উপর খুব ধকল গিয়েছে। বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি, ওমি ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। শুধু ঘুম না, ঘুমের সঙ্গে স্বও দেখে ফেললাম। স্বপুটা কুদ্দুসকে নিয়ে। স্বপ্নের মধ্যে কুদ্দুস বেঁচে আছে। আমাকে এসে বলল, ছোট মামা এগারটা টাকা দিতে পারবেন? এগারটা টাকা শর্ট পড়েছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি আমাকে মামা ডাকছ কেন কুদ্দুস? আমাকে না। সব সময়ই ভাই ডাকতে?

কিছু মনে করবেন না ভাইজান, ভুল হয়ে গেছে টাকার অভাবে মাথা ঠিক নেই। কী বলতে কী বলি। শেষ সময়ে এগারটা টাকা শর্ট পড়ল।

আরেকটা কথা কুদ্দুস, তুমি না মারা গেছ। তাহলে কথা বলছ কী করে?

স্বপ্নের এই পর্যায়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি মাথার কাছে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমার গাঝাঁকাচ্ছেন। বাবাবললেন,তোর একটু নবীনগর যাওয়া লাগে। কুদ্দুসের বৌছেলেমেয়ে আছে, এদের শেষ দেখা দেখানো দরকার।

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, এখন নবীনগর যাব?

হ্যাঁ। তুই একা যাবি না। তোর সঙ্গে ভোলাবাবুও যাবে। ভাগ্য ভালো, হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। নিজে থেকেই সঙ্গে যেতে রাজি হল।

যাব কিভাবে?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছিস কেন? এটা আবার কোন দেশি ভদ্রতা? আর ঘুমটাই বা তোর এল কীভাবে? এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, বাড়িতে ডেডবডি।

আমি বাবার সঙ্গে একতলায় নেমে এলাম। কুমিল্লা যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বেশ আলোব্যবস্থা। কুদ্দুসের ভাই এসেছে। তার বগুড়া যাওয়া হয় নি। আরিচাঘাটে গণ্ডগোল

হওয়ায় ফিরে এসেছে। ফিরে এসে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে কোত্থেকে যেন একটা ট্রাক যোগাড় করেছে।

ডেডবডি ট্রাকে তোলা হয়েছে। ভোলাবাবুও ডেডবডির সঙ্গে ট্রাকের পেছনে বসে আছেন। আমাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন, ড্রাইভারের সঙ্গে বসে কী করবেন? পেছনে চলে আসেন, হাওয়া খেতে খেতে যাব। সিনসিনারি দেখব। আমি পেছনেই উঠলাম। ট্রাক ছাড়ল সন্ধ্যার আগে আগে। ভোলাবাবু বললেন, পেছনে উঠার একটাই অসুবিধা, সিগারেট খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না।

আমি কিছু বললাম না। ভোলাবাবু বললেন, কিছু চিন্তা করছেন নাকি ভাইজান?

জ্বি না।

মানুষ কখন কোথায় থাকবে বলা খুব মুশকিল। আমি এই বাড়িতে এসেছিলাম কী জন্যে জানেন? বড় সাহেবের কাছ থেকে টাকা ধার করতে। একটা লুঙ্গি কিব। এগারটা টাকা শর্ট পড়ে গেল। ভাবলাম, বড় সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে আসি। এসে দেখি এই ব্যাপার।

কত টাকা শর্ট পড়েছে বললেন?

এগার টাকা।

আমি অবাক হয়ে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এগার টাকার কথা বলছে কেন? স্বপ্নেও আমি কি ঠিক এই দৃশ্যই দেখি নি? স্বপ্নেও তো কুদ্দুস এ রকম ফতুয়ার মতো

একটা পোশাক পরে এসে বলেছিল, ভাইজান, এগারটা টাকা শর্ট পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়? আর কিছুই কি এর মধ্যে নেই?

ভাইজান, কী ভাবেন?

কিছু ভাবি না। ভাবনের কিছু নাই। এই মানুষটা মরে আপনাদের খুব সুবিধা করে দিয়ে গেল। এখন দেখবেন আর কোন চিন্তা নাই।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

এখন মিলমিশ হয়ে যাবে। কুমিল্লার কাজ শেষ করে ঢাকায় যখন ফিরবেন, দেখবেন সব ঠাণ্ডা। আপনার হোট চাচী ফিরে আসছেন। তাঁর অসুখও আর নাই। মাঝখান থেকে এই বেচারা শেষ।

এইগুলো কি আপনার ভবিষ্যদ্বাণী?

জ্বি।

ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়?

জ্বি হয়।

ভাইজানের সঙ্গে কি সিগারেট আছে?

আছে।

আমি সিগারেট বের করে দিলাম। ভোলাবাবু সিগারেট রাতে ধরাতে বললেন, মানুষ যখন বলে হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা, তখন খুব মজা লাগে ভাইজান। মনেমনে হাসি আর বলি, তুমি কী করব? তোমার কি করার কোন ক্ষমতা আছে? ফালাফালি কইরা তো লাভ নাই। কী কন ভাইজান?

তা তো ঠিকই।

একটা শ্যামা সঙ্গীত শুনবেন ভাইজান?

না, থাক।

আচ্ছা থাক।

থাক বলেও গুনগুন করে ভোলাবাবু কী যেন গাইতে লাগলেন। আমার ঘুম পেতে লাগল। কুদ্দুসের বাড়ি পৌঁছলাম গভীর রাতে, আধো-ঘুম ও আধো-জাগরণে।

আকাশে চাঁদ। জ্যোৎসা ঢাকা গ্রাম। অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ। এক জন বুড়োমানুষ লণ্ঠন হাতে বের হয়ে এলেন এবং অবাক হয়ে বললেন, আপনারা কারা বাবাসগল?

৫. পরপর তিনটি অদ্ভুত চিঠি

রিমির কাছ থেকে পরপর তিনটি অদ্ভূত চিঠি পেলাম।

প্রথম চিঠিটির উপর লেখা—প্রথম কবিতা। তার নিচে আট লাইনের এক ইংরেজি কবি। অনেক চেষ্টা করেও সেই কবিতার কোনো অর্থ উদ্ধার করতে। পারলাম না। কবিতার নিচে রিমির নাম লেখা। সে নিজেই কবিতার রচয়িতা কি-না, কে জানে।

দ্বিতীয় চিঠির উপরে লেখা দ্বিতীয় কবিতা। আট লাইনের একটা বাংলা কবিতা। এই কবিতার নিচেও রিমি লেখা। বাংলা বলেই বোধহয় এই কবিতাটির অর্থ বোঝা যায়

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি হার ছিল শত শত,
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিতো দুচারটে তার পাতা,
আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে।

তৃতীয় চিঠির শিরোনাম হচ্ছে—প্রেসক্রিপশন। সেখানে সত্যি সত্যি কী-সব ওষুধপত্রের নাম লেখা। ক্লোরামফেনিকল, ডোজ-প্রতি এক শ সিসি ওজনের জন্যে চার থেকে পাঁচ সিসি। বার ঘন্টা পরপর। এসবের মানে কি? আমি রিমিদের বাসায় টেলিফোন করলাম ফোন

ধরলেন খালা। খালা টেলিফোন ধরবেন, এই ভয়ে আমি রিমিকে কখনো টেলিফোন করি না।

তোদের খবর কী-রে?

খবর ভালো।

কী-সব যেন শুনছি—তোর ছোট চাচী না-কি ফিরে এসেছে?

এখনো আসেন নি, তবে এসে যাবেন বলে মনে হচ্ছে।

তোদর কাণ্ডকারখানা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ নার্স মেয়ে এখন কোথায় থাকে?

বাসাতেই থাকে।

বাসাতেই থাকে, আর কেউ কিছু বলে না?

বলার তো কিছু নেই, নিজের অধিকারে সে আছে।

অধিকার! অধিকার আবার কী?

আমি চুপ করে রইলাম। অধিকার ব্যাখ্যা করার যন্ত্রণায় যেতে ইচ্ছে করছে না। দীর্ঘ বক্তৃতায় লাভও কিছু নেই। খালার কানে হাই পাওয়ার আয়না জাতীয় কিছু। আছে। কথা যা বলা হয় ঐ আয়নার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

হ্যালো টুকু।

জ্বি।

কথা বলছি না কেন?

কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন না, তাই বলছি না।

তার মানে?

মানে কিছু নেই। আপনি কি কাইন্ডলি একটু রিমিকে দেবেন?

খালা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর ভারী করে বললেন, রিমিকে কেন?

একটু দরকার ছিল।

কী দরকার?

আপনাকে বলা গেলে তো শুরুতেই বলতাম। আপনাকে বলা যাবে না।

খালা খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। রিমির সঙ্গে আমার কী দরকার। থাকতে পারে, তাই নিয়ে সম্ভবত ভাবতে বসলেন। আমার মনে হল তিনি রিমিকে ডেকে যে দেবেন না

সেই অজুহাত তৈরি করতে তাঁর সময় লাগছে। আমি আবার বললাম, রিমিকে একটু ডেকে দেবেন খালা?

ওকে তো ডাকা যাবে না।

ডাকা যাবে না?

না। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ঘুমিয়ে পড়ল?

ইয়ে, ওর খুব মাথা ধরেছে। বাতি-টাতি নিভিয়ে শুয়ে আছে। বলে দিয়েছে যেন তাকে ডিস্টার্ব না করা হয়। এখন ডাকতে গেলে খুব রাগ করবে।

তাহলে থাক, ডাকার দরকার নেই। একটা জরুরি কথা ছিল। থাক, অন্য সময় বলব।

এই বলেই মনে মনে হাসলাম, কারণ খালার কৌতূহল এখন তুঙ্গে উঠেছে। রিমিকে না ডেকে পারবে না। তাকে ডাকবেন এবং টেলিফোনের কথাবার্তা শোনার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

খালা বললেন, জরুরি কথাটা আমাকে বল। ও ঘুম থেকে উঠলে বলে দেব।

আপনাকে বলা ঠিক হবে না। ভয়-টয় পাবেন।

ভয় পাব কেন? ব্যাপারটা কী?

আপনাকে বলা যাবে না খালা। আচ্ছা রাখি...

একটু লাইনে থাক, আমি দেখি রিমিকে আনা যায় কি-না।

আমি টেলিফোন কানে নিয়ে বসে রইলাম। খালা রিমিকে ডাকতে গেলেন।

রিমি টেলিফোনের রিসিভার হাতে নিয়েই শীতল গলায় বলল, কাল সকাল দশটায় নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানগুলোর আশপাশে থাকবি।

আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি বৃথাই খানিকক্ষণ হ্যালো, হ্যালো করলাম।

মনস্থির করে ফেললাম, আগামীকাল সকাল দশটায় নিউমার্কেটের ধারেকাছেও আমি থাকর না। আমাকে না দেখে সে অবাক হবে, দুঃখিত হবে, বিস্মিত হবে। এই তিন ধরনের অনুভূতি একত্রে খানিকক্ষণ খেলা করবে, তারপর রাগে তার শরীর জ্বলে যাবে। জ্বলুক। ডাক দিলেই ছুটে যেতে হবে? রূপবতীদের একসময়-না-একসময় বুঝিয়ে দিতে হয় তাদের ডাক নিশিডাকের মত না। তাদের ডাকও অগ্রাহ্য করা যায়।

তাছাড়া ওর ডাকে ছুটে যাওয়া মানে সেধে অপমানিত হওয়া। একবার ঠিক দুপুর দুটায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে বলল। কাঁটায় কাঁটায় দুটার সময় আমি যেন দুপ্যাকেট চিপস এবং এক প্যাকেট কাজুবাদাম নিয়ে উপস্থিত থাকি। বোটানিক্যাল গার্ডেন কি এখানে?

মিরপুর ছাড়িয়েও আরো অনেকখানি। দুপুরে না খেয়ে তিনবার বাস বদল করে ঘামতে ঘামতে পৌঁছলাম। সাড়ে তিনটা পর্যন্ত গেটে লাইটপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। রিমির দেখা নেই। খিদেয় অস্থির হয়ে চিপস এবং কাজুবাদাম নিজেই খেয়ে ফেললাম এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় পর পর তিনবার বললাম, রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না, রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না, রিমি নামে কাউকে আমি চিনি না।

তবে নিউমার্কেট হাতের কাছে। ইচ্ছা করলে একবার উঁকি দিয়ে দেখা যায়। এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আমি জানি ইচ্ছা করবে। দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগে মনে হবে বিশ্ব-সংসার রসাতলে যাক, আমি নিউমার্কেটে যাব।

আগামীকাল বাসায় থাকা আমার খুবই জরুরি। কারণ মির্যাকল ঘটে গেছে। ছোট চাচী সত্যি সত্যি চলে আসছেন। দুই পক্ষের কথাবার্তায় ঠিক হয়েছে অতীত ভুলে নতুন করে সব শুরু করা হবে। পুরনো কথা ভোলা হবে না। যা হবার হয়ে গেছে। নার্স মেয়েটিকে টাকা-পয়সা দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থা করা হবে। সবার ধারণা, এই মেয়ে বেঁকে বসবে। এরকম কিছু হলে শক্ত হতে হবে। দরকার হলে ভয় দেখাতে হবে। ছোট চাচা তাঁর ফাইনাল কথা বলে দিয়েছেন। তিনি আমার মাকে ছাদে ডেকে নিয়ে বলেছেন—আপনারা যা ভালো বোঝেন করেন, আমার কিছু বলার নেই। মা এই কথা শুনে বিজয়ীর ভঙ্গিতে নেমে এসেছেন।

আজ রাতে সমিতাকে বড় চাচার ঘরে ডাকা হবে। সেখানে শুধ মরুরীরা থাকবেন। তাঁরা তাকে বোঝবেন, দরকার হলে ভয় দেখাবেন। এই আসরে ছোট চাচীর বাবা জাজ সাহেবও থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে। বড় চাচা বলেছেন, আমাদের সমস্যা

আমরাই মেটাব। আপনি মুরুব্বী মানুষ আপনার থাকার দরকার নেই। জাজ সাহেব বলেছেন, লিগ্যাল পয়েন্টগুলো মেয়েটিকে ভালোমলতা বুঝিয়ে দেবেন। তাকে পরিষ্কার বলবেন যে, তার বিয়ে অসিদ্ধ। কোর্ট এ্যাকসেপ্ট করবে না। আমরা কোর্টে প্রমাণ করে দেব যে, ছেলেকে ট্রাপে ফেলে এই বিয়ে করা হয়েছে। বিয়ের মূল লক্ষ ছিল অর্থ আত্মসাৎ। এটা প্রমাণ করা গেলে তারই বিপদ, উল্টো জেল খাটতে হবে। আপনারা বলবেন যে, আমরা কোর্ট-ফোর্টের ঝামেলায় যাব না, শান্তিপূর্ণ সমাধানই আমাদের লক্ষ।

বড় চাচা বললেন, সব পয়েন্ট বলা হবে।

শুধু পয়েন্ট বললে হবে না থ্রেট করতে হবে। এই জাতীয় মেয়েরা তেড়িয়া কিসিমের হয়। এদের ঘাড়ের রগ থাকে একটা মোটা।

কারেক্ট বলেছেন। একটা না, এদের ঘাড়ের সব কটা রগ থাকে মোটা।

দেখা গেল সমি নামের মেয়েটির ঘাড়ের রগ মোটা নয়, সে তেড়িয়া কিসিনেরও নয়। বড় চাচার ঘরের মাঝখানের চেয়ারে শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। আমি তার মুখের ভাব দেখতে পারছিলাম না। কারণ, আমি ঘরের বাইরে জানালার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটির পেছনটা দেখতে পাচ্ছি।

বড় চাচা বললেন, আমি কী বলছি বুঝতে পারছ?

পারছি।

তোমার কি কিছু বলার আছে?

না।

বলার থাকলে বলতে পার। আমরা তোমার কথাও শুনব। আমরা ঝগড়া করতে বসি নি।

আপনারা কি আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছেন?

অবশ্যই।

আপনার ছোট ভাই অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব, তিনিও কি তাই চান?

সে না চাইলে আমরা মিটিঙে বসলাম কেন? সে-ই বেশি চাইছে।

বেশ, আমি চলে যাব।

বড় চাচা অত্যন্ত রাসভারী গলায় বললেন, তোমার যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পার। আমরা শুনব।

আমার কিছুই বলার নেই।

তুমি যদি মনে কর কোর্টের আশ্রয় নেবে, তাহলে ভুল করবে।

আপনাদের চিন্তার কিছুই নেই। আমি কোর্টে যাব না।

অবশ্যি তমি চাইলে কমপেনসেশনের ব্যাপারটা নিয়েও আমরা চিন্তা করব। এটা আমরা পুরোপুরি রুল আউট করে দিচ্ছি, তা না। যদিও লিগ্যালি ইউ আর নট বাউন্ড।

সমিতা সবাইকে অবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, আমি তাহলে যাই।

এখনি যাবে?

হুঁ। মেয়েটা থাকবে। কোথায় গিয়ে উঠবো কোনো ঠিক নেই। আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করে তারপর ওকে নিয়ে যাব।

এখনই যে যেতে হবে, তা না। কাল ভোরে মেয়েটাকে নিয়ে একসঙ্গে যাও।

আপনাদের ভয় করার কিছু নেই। মেয়েটাকে আমি আপনাদের ঘাড়ে ফেলে রেখে যাব না। নিয়ে যাব। দু এক দিনের মধ্যেই নেব। আমি যাব আজ রাতেই।

সবার বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। এত বড় একটা ঝামেলা এত সহজে মিটে যাবে, তা কেউ ভাবে নি।

সমিতা আমার ঘরে ঢুকে খুব সহজ গলায় তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলল। তাদের পুরো কথোপকথনটি হল আমার সামনে। যেন সমবয়েসী দুজন মানুষ কথা বলছে।

মা-মণি, আমি আজ রাতে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

আমিও কি যাচ্ছি?

না, তুমি আরো দু একদিন থাকবে। পারবে না?

পারব।

আগের বাসাটা তো ছেড়ে দিয়েছি। কোথায় গিয়ে উঠব তা তো জানি না। কাজেই এখন তোমাকে নিচ্ছি না। বুঝতে পারছ?

পারছি। মা, ওরা কি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে?

হ্যাঁ।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল, ওরা তাড়িয়ে দেবে।

তাহলে মামণি আমি এখন যাই?

আচ্ছা যাও।

সমিতা ঘর থেকে বের হবার আগে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কি কিছু বলবে? লরেটা শান্ত গলায় বলল, এই কদিন কি আমি স্কুলে যাব?

দরকার নেই। একা একা এত দূর যেতে পারবে না।

টুকুকে বললে ও আমাকে নিয়ে যাবে।

সমিতা বিস্মিত হয়ে বলল, নাম ধরে ডাকছ কেন?

ও তো আমার বন্ধু; কাজেই নাম ধরে ডাকছি। ও আমাকে নাম ধরে ডাকতে বলেছে।

সমিতা পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। পূর্ণ দৃষ্টিতে কেউ যখন তাকায় তখন তার চোখের ভেতর দিয়ে তাকে অনেকখানি দেখা যায়। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সমিতা নামের এই মেয়েটি তো বড় ভালো। আমি বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওকে দেখেশুনে রাখব।

সমিতা কিছু বলল না। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

রাত নটায় একটি বেবিট্যাক্সি ডেকে আনা হল। সমিতা একটা বড় সুটকেস, একটা হ্যান্ডব্যাগ এবং একটা বেতের ঝুড়ি নিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসল। বিদায়ের সময় পুরুষদের কাউকে দেখা গেল না, তবে মেয়েরা সবাই এল। মা বললেন, টুকু, তুই এর সঙ্গে যা। রাত হয়েছে, পৌঁছে দিয়ে আয়।

সমিতা না-সূচক কিছু বলতে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত বলল না। সম্ভবত তার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। আমি ড্রাইভারের পাশে জায়গা করে বসে পড়লাম। গাড়ি উত্তর শাহজাহানপুর ছাড়িয়ে প্রায় বস্তির মতো কিছু ঘরবাড়ির সামনে থামল। জায়গাটা ঢাকা শহরের ভেতরে হলেও ইলেকট্রিসিটি নেই। কাছেই কোথাও মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা ফেলে নিচু জায়গাটা ভরাট করা হচ্ছে। সেই আবর্জনার ভয়াবহ উৎকট গন্ধ। নাড়িভুড়ি উলটে আসার জোগাড়।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। অনেকটা রাস্তা হেটে যেতে হবে। আমি বললাম, সুটকেসটা আমাকে দিন। মেয়েটা বিনা বাক্যব্যয়ে সুটকেস দিল। বেবিট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা রওনা হলাম। সারা পথ কথাবার্তা হল না। একটা একতলা দালানের সামনে এসে সমিতা বলল, এই বাড়ি।

আমি সুটকেস নামিয়ে নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত।

সমিতা অসম্ভব নরম গলায় বলল, কেন?

আমি সেই কেন-র জবাব দিতে পারলাম না। সুটকেস নামিয়ে রেখে এলাম। বেবিট্যাক্সির কাছে এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, সমিতা তখনো ঘরে ঢেকে নি। তার জিনিসপত্র নিয়ে অন্ধকারে একতলা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক করে রেখেছিলাম, সকাল সাড়ে দশটায় নিউমার্কেটে যাব না। রিমি রাগ হলে হোক, বিরক্ত হলে হোক।

যে রকম ভেবে রেখেছিলাম, সে রকম করা গেল না। আমি সাড়ে দশটা বাজার পনেরো মিনিট আগেই এসে উপস্থিত হলাম। বারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করলাম বইয়ের দোকানগুলোর সামনে। রিমির দেখা নেই। সাড়ে বারোটায় এক ডিসপেনসারি থেকে টেলিফোন করলাম। রিমি বাসাতেই আছে। আমি আহত স্বরে বললাম, রিমি, তোর না আসার কথা। রিমি বলল, আমি আসব, এমন কথা তো বলি নি। তোক আসতে বলেছি।

কেন?

এম্নি।

এম্নি কেন?

এম্নি মানে এম্নি। আচ্ছা শোন, তুই প্রেসক্রিপশনটা পেয়েছিল?

হ্যাঁ, কিসের প্রেসক্রিপশন?

ঘোড়া এবং গরুর অসুখ-বিসুখ হলে এই প্রেসক্রিপশন পশুডাক্তাররা দেন। তোকে দিচ্ছি, কারণ, তোর কাজে লাগবে।

ও আচ্ছা।

রাগ করলি নাকি?

না।

তোর কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে রাগে কাঁপছিস।

কিছুটা রাগ যে করি নি, তা না। তবে রাগে কাঁপছি না।

আচ্ছা, আমি কি তোর সঙ্গে একটু ঠাট্টাও করতে পারব না?

ঠাট্টা।

হ্যাঁ ঠাট্টা। আজ দিনটা ঠাট্টার জন্যে চমৎকার। তুই ভুলে বসে আছি, আজ তোর জন্মদিন। গত জন্মদিনে তোক বলেছিলাম না আগামী জন্মদিনে তোকে ঘোল খাওয়াব? মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

এখনো রাগ আছে?

না।

তোর জন্যে একটা উপহার কিনে গতকাল নওরোজ কিতাবিস্তানে দিয়ে এসেছি। ওখানে গিয়ে আমার নাম বললেই দেবে।

এটাও নিশ্চয়ই ঠাট্টা?

না, ঠাট্টা না। পরপর দুবার ঠাট্টা করা যায় না। লেবু একবারই কচলানো যায়। দুবার কচলালে তেতো হয়ে যায়। উপহার তোর পছন্দ হয়েছে কিনা জানাবি। সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লিখে জানাবি।

আর যদি অপছন্দ হয়?

অপছন্দ হলে চিঠি-ফিটি লিখতে হবে না। তবে অপছন্দ হবে না। যদিও তার রুচি খুব খারাপ।

থ্যাংকস।

থ্যাংকস কেন? উপহারের জন্যে? নাকি জন্মদিন মনে রাখার জন্যে?

জন্মদিন মনে রাখার জন্যে।

তোর নিজের মনে ছিল না। তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

তুই যা। নওরোজ কিতাবিস্তানে চলে যা। গিয়ে আমার নাম বলবি।

আচ্ছা যাচ্ছি। থ্যাংকস এগেইন।

বার বার থ্যাংকস দিতে হবে না। এটা বিলেত-আমেরিকা না। ফোন রাখলাম। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

আমি সেই দোকানে গেলাম। দোকানের মালিক অবাক হয়ে বললেন, কই, আমাদের কাছে তো কেউ কিছু দিয়ে যায় নি।

৬. আমরা ভয়াবহ যন্ত্রণায় ছিলাম

আমাদের দেখে কে বলবে চার দিন আগেই আমরা ভয়াবহ যন্ত্রণায় ছিলাম?

কেউ বলবে না।

বলার কথাও নয়।

এখন সব স্বাভাবিক। বড় চাচা ব্যাগ বোঝই করে বাজার করছেন। শীতের নতন আনাজ উঠেছে-অবিশ্বাস্য দামে তিনি সেসব কিনে হাসিমুখে বাড়ি ফিরছেন এবং সবাইকে ধাঁধা ধরার মতো করে বলছেন, বল তো, টমেটো কত করে আনলাম?

কি, বলতে পারলি না? একজেক্ট ফিগার বলতে পারলে দশ টাকা দেব।

মীরা সম্ভবত আবার কোনো ছেলের প্রেমে পড়েছে। একটি বিরহের গান দিনে পঞ্চাশ বার বাজাচ্ছে। গানের ভাব হচ্ছে—তুমি আর আমি দুই পথের যাত্রী। এই জীবনে দুই পথ এক হবে না ইত্যাদি। শুটকো মতো একটা ছেলেকে ঘাড় কুঁজো করে প্রায়ই আমাদের বাসার সামনের রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই ছোকরাই মীরার সাম্প্রতিক প্রেমিক। রূপবতী মেয়েরা প্রেমিক হিসেবে কুৎসিত ছেলেদের বেশি পছন্দ করে কেন কে জানে।

ছোট চাচা ফিরে এসেছেন। রোগী দেখা শুরু করেছেন। রোগী আসছে স্রোতের মতো।

ছোট চাচীও ফিরে এসেছেন। তাঁর ঘন ঘন অসুখ হবার ঝামেলাটা এই শীতে একটু কম বলে মনে হচ্ছে। গতকাল আমার সঙ্গে হাসিমুখে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। আলাপের বিষয়বস্তু হচ্ছে—তিনি শিগগিরই বাচ্চা নেবার কথা ভাবছেন। যদিও বাচ্চা নেয়া মানে ফিগারের দফারফা, তবু নেবেন। ব্রেস্ট ফিডিং না করালেই হল। আলাপের এক পর্যায়ে বললেন, মেয়েদের বুকের সেইপ নষ্ট হয়ে গেলে তো সবই নষ্ট। তাই না টুকু?

আমি উত্তর না দিয়ে ঢোঁক গিললাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, তুমি দেখি লজ্জায় একেবারে বেগুনি হয়ে যাচ্ছ। লজ্জা পাবার মতো কী বললাম? যা বলেছি সবই সত্যি। হার্ড ফেক্ট। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

পত্র পুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাতা পূজার কুসুম দুটি।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবেরই যদি এই ভাব হয় তাহলে সাধারণ পুরুষদের অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখ....

আলোচনা বেশিদূর এগুতে না দিয়ে আমি চলে এলাম। এ বাড়ির সবাই সুখে আছে। এটাই আমার সুখ। তবে কুসুমে কাঁটার মতো একটা কাঁটা এখনো আছে। সমিতা তার মেয়েটিকে নিয়ে যায় নি। বাড়ির কেউ তা নিয়ে চিন্তিতও না। মেয়েটি কান্নাকাটি করছে না, হৈচৈ করছে না, এতেই সবাই খুশি। আমি তাকে রোজ স্কুলে দিয়ে আসছি, স্কুল থেকে নিয়ে আসছি। সে একবারও তার মার কথা জিজ্ঞেস করছে না। আমিও নিজ থেকে কিছু বলছি না। রাতে ঘুমুবার আগে দুজন বয়স্ক মানুষের মতো খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করি। আমার

জন্মদিনে রিমি যে কাণ্ডটা করল আমি তা বেশ সহজভাবেই তাকে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, রিমির এই কাজটা কি উচিত হয়েছে?

লরেটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, উনি তোমাকে খুব পছন্দ করে তো, তাই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। পছন্দের মানুষকে কষ্ট দিতে খুব ভালো লাগে।

কে বলল তোমাকে?

মা বলেছে। এই যে মা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে না; তার কারণ মা আমাকে পছন্দ করে।

তুমি ঘুমাও।

আচ্ছা।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার মনটা এতই খারাপ হল যে, ঘুম এল না। ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। বড় বড় নিঃশ্বাস নিলাম। প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন শরীরে নিলে না-কি ঘুম পায়। ঘুম পেল না। তৃষ্ণা পেয়ে গেল।

আজ ঘরে পানির জগ রাখতে ভুলে গেছি। নামতে হল একতলায়। পর পর তিন গ্লাস পানি খাবার পরও তৃষ্ণা মিল না। তৃষ্ণা ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। মাঝে মাঝে কিছুতেই তৃষ্ণা মেটে না। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে সত্যি, না সার ক্ষেত্রে তা জানি না। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বসার ঘর থেকে নাক ডাকার অদ্ভুত শব্দ আসছে। সন্ন্যাসী ভোলাবাবু নাক ডাকাচ্ছে। কিছুদিন ধরে এই সন্ন্যাসী রোজ আসছে। বড় চাচার সঙ্গে গুজ গুজ, ফিস ফিস করছে। রাতে বসার ঘরের কার্পেটে কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দারোয়ান বা মালীর ঘরে সে ঘুমুবে না, ঘুমুবে বসার ঘরে। আমার মার ধারণা, এই ব্যাটা একরাতে আমাদের খুন-টুন করে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবে। মা তার এই আশংকার কথা অনেককেই বলেছেন, কেউ আমল দেয় নি।

সবার ঘরে উঁকি দেবার আমার কোনোই প্রয়োজন ছিল না—সম্ভবত নাক ডাকার শব্দে আকৃষ্ট হয়েই উঁকি দিলাম। ঘর অন্ধকার, সন্ন্যাসী নাক ডাকাচ্ছে অথচ আমি পা দেয়ামাত্র সে ভারী গলায় বলল, ভাইজানের কাছে সিগারেট আছে? আমি হকচকিয়ে গেলাম।

আছে ভাইজান সিগ্রেট?

আপনি কি জেগে ছিলেন না-কি?

জ্বি না, ঘুমাচ্ছিলাম।

আমি ঘরে পা দেয়ামাত্র ঘুম ভেঙে গেল?

জ্বি।

এবং অন্ধকারেও বুঝতে পারলেন আমি কে?

জ্বি।

কিভাবে বুঝলেন? আপনি কি অন্ধকারে দেখতে পান?

জ্বি না। অন্ধকারের দেখব কিভাবে? আমি তো আর বিড়াল না।

তাহলে বুঝলেন কী করে যে এটা আমি।

গন্ধ থেকে বুঝলাম।

গন্ধ থেকে বুঝে গেলেন?

জ্বি। সব মানুষের শরীরের গন্ধ আছে। মানুষের সঙ্গে যেমন মানুষের মিল নাই, এক মানুষের গন্ধের সঙ্গেও আরেক মানুষের গন্ধের কোনো মিল নাই।

আপনি কি সবার গন্ধ আলাদা করে চেনেন?

জ্বি না। যাদের সাথে কয়েকবার দেখা হয়, তাদেরটা চিনি। সিগ্রেট আছে ভাইজান?

সঙ্গে নেই, তবে ঘরে আছে।

থাক, বাদ দেন। তিনতলায় যাবেন আবার নামবেন। দরকার নাই।

দরকার নাহলে তো ভালোই। যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি তৃষ্ণা প্রসঙ্গে। আপনার কি কখনো এমন হয়েছে যে খুব পানির তৃষ্ণা হয়েছে, পানি খেয়েই যাচ্ছেন কিন্তু তৃষ্ণা মিটছে না?

না। শরীরের তৃষ্ণা তো সহজেই মেটার কথা। মনের তৃষ্ণা নিয়েই সমস্যা। ঐ তৃষ্ণাটা কখনো মিটে না।

এইসব কথাবার্তা আপনি কি ভেবেচিন্তে বলেন, না যা মনে আসে বলে। ফেলেন?

যা মনে আসে বলি না। টুকু সাহেব?

জ্বি।

আপনাদের সমস্যা তো মিটে গেল।

তাই তো দেখছি।

ট্রাকে করে কুদ্দুসের ডেডবডি নিয়ে যাবার সময় আপনাকে বলেছিলাম না, এই মৃত্যুর পর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

তা বলেছিলেন।

ছোট্ট একটা সমস্যা অবশ্যি থেকেই গেল।

কোন সমস্যার কথা বলছেন?

বাচ্চা মেয়েটার কথা বলছি। লরেটা বোধহয় নাম।

ওর কী সমস্যা?

আমার তো মনে হয় ওর মা তাকে নিতে আসবে না।

আপনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন?

জ্বি না। অনুমানে বলছি। পাঁচ দিন হয়ে গেল, এখনো আসছে না ভয়ংকর কিছু নাহলে তো এক জন মা কখনো এই কাজ করবে না। আচ্ছা, এখন যান ঘুমান গিয়ে।

আমি বুঝলাম, সন্ন্যাসী পাশ ফিরল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা শুরু হল। সত্যি সত্যি কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে, না-কি আমাকে অভিভূত করবার জন্যে ভান করছে? সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রচুর ভান করতে হয়। তাদের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্যের একটি হচ্ছে ইমেজ রক্ষা। ব্যাটা সম্ভবত সারাক্ষণই জেগেছিল। নাক ডাকাটা তার কোনো এক কৌশল। কৌশল হলেও মজার কৌশল। গন্ধের ব্যাপারটাও চমৎকার, তবে হকচকিয়ে যাবার মতো কিছু নয়। কুকুরের মতো ঘ্রাণশক্তি কিছু মানুষের মধ্যে অবশ্যই থাকতে পারে। পশুদের স্বভাব-চরিত্রের অনেক কিছুই তো মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

আমি দোতলায় উঠে এলাম, তবে সন্ন্যাসীকে মন থেকে পুরোপুরি তাড়াতে পারলাম না। একটা সিগারেট নিয়ে আবার কি ফিরে আসব? খানিকক্ষণ গল্প করব? মন্দ কী?

নিজের ঘরে ঢুকে নামতে ইচ্ছা করল না। ঘুম পেতে লাগল। প্রচণ্ড ঘুম পাওয়ার। লক্ষণটা ভালো না। এই জাতীয় ঘুম বিছানায় যাবার আগ পর্যন্ত থাকে। বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। আমার বেলায়ও তাই হল। বালিশে মাথা রাখামাত্র ঘুম চলে গেল। ঘরে শুয়ে অনেক রকম পরিকল্পনা করলাম। তার একটি হল বাচ্চা মেয়েটির মাকে খুঁজে বের করা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রমহিলাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত এগারোটার দিকে যে বাড়ির সামনে নামিয়ে রেখে এসেছিলাম। সে বাড়িতে সমিতা ছিল মাত্র এক রাত। ভোরবেলাতেই সুটকেস নিয়ে চলে যায়। কোথায় যায় তাও বাড়ির কেউ জানে না। জানার আগ্রহও নেই। যেখানে ইচ্ছা যাক সবারই এরকম একটা মনোভাব।

আমি সারাদিনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খুজতে লাগলাম। এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি। কেউই কিছু জানে না। গ্রামের বাড়িতে খোঁজ করব সেই উপায়ও নেই, কারণ ভদ্রমহিলার গ্রামের বাড়ি নেই। কোলকাতার মেয়ে। উনিশ শ ষাট সনে ঢাকায় এসেছে।

রাত এগারোটায় খোঁজার পর্ব বন্ধ করলাম। জায়গাটা খারাপ। যে কোনো মুহূর্তে ঘড়ি, মানিব্যাগ, শার্ট, স্যুয়েটার খুলে নেবে। কপাল মন্দ হলে পেটে ক্ষুর ঢুকিয়ে দু একটা পপাঁচ দেবে। আগে এসব ক্ষেত্রে চিৎকার-চেঁচামেচি করলে লোকজন ছুটে আসত, এখন দৌড়ে উল্টো দিকে পালিয়ে যায়। বিটের পুলিশ হঠাৎ করে বধির হয়ে যায়, তাদের চলৎশক্তি থাকে না। তারা উদাস দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটা দেখে।

আমি ঠিক করলাম, রিমিদের বাসায় চলে যাব। রিমিদের বাসা কাছেই। সে গাড়ি করে নিশ্চয়ই আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। রিমিদের বসার ঘরে আলো জ্বলছে। ঢুকে দেখি, খালা সেজেগুজে বসে আছেন। তাঁর সামনে কালো জ্যাকেট পরা এক ভদ্রলোক। দুজনের সামনেই কফির কাপ। খালা কুঁচকে বললেন, তুই কী মনে করে?

যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম...

কোনো খবর আছে, না এম্নি এসেছিস?

খবর নেই, এম্নি।

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, দুপুররাতে মানুষের বাসায় আসার মানে কি? তোদর কি কাণ্ডজ্ঞান কখনো হবে না?

আমি অপমান হজম করে হাসিমুখে বললাম, রিমি বাসায় আছে?

বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? ও ঘুমুচ্ছে। তুই বোস এখানে, নাকি চলে যাবি?

বসি খানিকক্ষণ।

আমি বসামাত্রই ভদ্রলোক গল্প শুরু করলেন। ভদ্রলোক মনে হল। হিমালয়বিশারদ। হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী খুব বিতং করে বলছেন।

হরিদ্বার হচ্ছে হিমালয়ের সিংহ-দরজা। কোলকাতা থেকে হরিদ্বার যাবার দুটো ট্রেন আছে। একটা হচ্ছে দুন এক্সপ্রেস। রাত নটা দশ মিনিটে ছাড়ে। অন্যটা হচ্ছে। জনতা এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব হচ্ছে পনের শ কিলোমিটার।

খালা বললেন, পনের শ কিলোমিটার সমান কত মাইল?

ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার হচ্ছে এক মাইল, কাজেই এবাউট...

ভদ্রলোককে হিসেব শেষ করতে না দিয়েই খালা কিশোরীদের গলায় বললেন, আপনি এত কিছু জানেন।

ভদ্রলোক এর উত্তরে হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে দরজার পর্দা সরিয়ে রিমি ঢুকে বরফের মতো গলায় বলল, টুকু, তুই ভেতরে আয়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলাম। রিমি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। চাপা গলায় বলল, ঐ লোক কখন থেকে বক্ বক্ করছে জানিস?

সন্ধ্যা থেকে?

না। দুপুর থেকে। দুপুরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে। তারপর থেকে বকবকানি চলছে।

যেতে চাচ্ছে না?

চাচ্ছে হয়ত, মা যেতে দিচ্ছে না। আমার অসহ্য লাগছে। তুই এসেছিস ভালো হয়েছে। এখন আমি মাকে একটা ভয় দেখাব। তোকে ভেতরে রেখে দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দেব।

তাতে লাভ কী?

তোর কোন লাভ নেই, মা ভয়ে ছটফট করবে, এটাই লাভ।

বলতে বলতে রিমি দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিল।

আমার গা ছম ছম করতে লাগল। রিমি বলল, খবর্দার, গায়ে হাত দেবার চেষ্টা। করবি না। গায়ে হাত দিলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।

আমি ফিস ফিস করে বললাম, তুই এত পাগল হলি কিভাবে?

রিমি বিরক্ত স্বরে বলল, পাগলের তুই কি দেখলি? আমি যা করছি খুব ভেবেচিন্তে করছি। মাকে আজ আমি একটা শিক্ষা দেব।

খালা উঠে এসেছেন। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে আতংকিত স্বরে ডাকছে, রিমি, এই রিমি।

রিমি বলল, কী চাও মা?

দরজা বন্ধ কেন?

আমরা গল্প করছি, এই জন্যে দরজা বন্ধ। গোপন গল্প তো। আমরা চাই না সবাই শুনুক।

খালা ভাঙা গলায় বললেন, দরজা খোল মা।

বিরক্ত করো না মা। এখন যাও।

ঐ ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন, কী হয়েছে?

খালা বললেন, কিছু হয় নি। রিমি না খেয়ে শুয়ে পড়েছে, তাই ডাকছি। আপনি রসার ঘরে গিয়ে বসুন।

ঐ ছেলেটা গেল কোথায়? আমি নাহয় ঐ ছেলেটার সঙ্গে গল্প করতাম।

খালা বললেন, ও চলে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে। বিচিত্র স্বভাব এই ছেলের। কাউকে কিছু না বলে চলে যায়।

খালার কথা শেষ হবার আগেই রিমি উঁচু গলায় বলল, টুকু তো কোথাও যায় নি। এখানেই আছে। আমরা গল্প করছি।

হুড়মুড় শব্দ শুনলাম।

খুব সম্ভব খালা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছেন।

আমি দরজা খোলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি, রিমি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, চুপ করে থাক, নড়বি না।

আমি অন্ধকারে অদ্ভুত মেয়েটার সঙ্গে বসে রইলাম।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত বারোটার মতো বাজল। বিরাট নাটক করে বের হলাম। খালার কান্না, দরজার ধাক্কাধাক্কি–কুৎসিত ব্যাপার। ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র খালা বললেন, আর কোনো দিন যদি তোক এ বাড়ির ত্রিসীমানাতে দেখি তাহলে জুতা দিয়ে পিটিয়ে লাশ বানাব। হারামজাদা কোথাকার!

রিমি বলল, মা, একে আমার সামনে ধমকা ধমকি করবে না। আমরা বিয়ে করে ফেলেছি।

কী বললি?

মুসলমানদের বিয়ে তো খুব সিম্পল—আমি তিনবার বলেছি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? সে বলেছে কবুল। Now we are husband and wife.

খালা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আমি পালিয়ে এলাম।

রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলাম। এই দুঃস্বপুটা আগেও কয়েকবার দেখেছি। আজ আবার দেখলাম, স্বপ্নে একটা পাগল আমাকে তাড়া করছে। পাগলের হাতে চকচকে একটা ক্ষুর। সে মৃদুস্বরে বলছে—ভয়ের কিছুনাই। ব্যথা দিমুনা। ক্ষুর খুব ধার। সে পেছনে পেছনে ছুটছে, তার মুখ দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু স্বপ্নে সবই সম্ভব। আমি পাগলটার মুখ

দেখতে পাচ্ছি। খুব চেনা মুখ অথচ চিনতে পারছি না। পাগলটার মুখে শিশুসুলভ সারল্য, চোখ দুটি মায়া মায়া, গলার স্বরও অতি মধুর। সে খানিকক্ষণ পর পরই বলছে, ভয়ের কিছু নাই। ক্ষুর খুব ধার। পোঁচ কইরা বসামু, টেরও পাবেন না।

জেগে উঠে দেখি, ঘামে সারা শরীর ভেজা। হৃৎপিণ্ড ধক্ ধ করছে। যেন সত্যি সত্যি এতক্ষণ ছুটছিলাম। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার ঘরে পানি থাকে না। একতলায় যেতে হবে পানির খোঁজে, অথচ যেতে ইচ্ছে করছে না, ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে, দরজা খুললেই পাগলটার দেখা পাব। স্বপ্নের ঘোর কাটার জন্যে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ঘোর পুরোপুরি কাটল না।

এ রকম একটা স্বপ্ন বার বার দেখার মানে কি ভাবতে ভাবতে দরজা খুলতেই দেখিছোট চাচা। আমার চিলেকোঠার ঘর। দরজা খুললেই পুরো ছাদটা চোখে পড়ে। ছোট চাচা সিগারেট হাতে ছাদে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, দুঃস্বপ্ন। দেখেছিস নাকি?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—হ্যাঁ, বুঝলেন কী করে?

গোঁ গোঁ শব্দ করছিলি।

খুব খারাপ স্বপ্ন। একটা পাগল ক্ষুর হাতে আমাকে তাড়া করছিল। পাগলটাকে চিনি; আবার চিনি না।

ছোট চাচা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, রাতে কী খেয়েছিলি? গুরুপাক কিছু খেয়েছিস, বদহজম হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ দুঃস্বপ্নের কারণ হচ্ছে বদহজম।

তাই নাকি? আমিতো শুনেছি সাব-কনসাস মাইন্ড...

দূর! দূর! স্বপ্নের মূল কারণ হচ্ছে স্টমাক। পেটরোগা মানুষ সব সময় দুঃস্বপ্ন দেখে।

বাজে কটা ছোট চাচা?

ঘড়ি নেই। দুটা থেকে আড়াইটা হবে। আমি একটার সময় ছাদে এসেছি।

ইনসমনিয়া?

হুঁ। আচ্ছা টুকু, ঐ মেয়েটার ব্যাপারে কিছু ভাবছিস? লরেটার কথা বলছি।

না।

ভাবা দরকার তো। আমার মনে হয় সমিতার কোনো আত্মীয়-বাড়িতে রেখে আসা দরকার।

আচ্ছা।

আচ্ছা নয়। কাজটা জরুরি।

জরুরি হলে তো করতেই হবে।

বাচ্চাটা তোর ছোট চাচীর মনে চাপ ফেলেছে। ও এখানে বেবি এক্সপেক্ট করছে। এই সময় মনে চাপ পড়লে বেবির গ্রোথ ভালো হয় না। বুঝতে পারছিস কী বলছি?

পারছি।

হুট করে একটা বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে...

এখন তো ঝামেলা শেষ। আনন্দের শুরু।

ঠাট্টা করছিস না-কি?

না। ঠাট্টা করছি না। ঠাট্টা করব কেন? ছাদে বেশিক্ষণ একা থাকা ঠিক না। ভূতের উপদ্রব।

ভূতের উপদ্রব মানে।

কমলা প্রায়ই ভূত দেখে।

তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছি নাকি? রাস্কেল।

আমি সহজ মুখে নিচে নেমে এলাম।

৭. এক তোড়া গোলাপ

আজ জাজ সাহেব দুটো গোলাপের জায়গায় এক তোড়া গোলাপ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। শুটকো লোকটা সাইকেলে করে গোলাপ নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে তিনিও একই সঙ্গে রিকশা করে উপস্থিত হয়েছেন। গোলাপগুলো তিনি নিজেও আনতে পারতেন, তা আনেন নি।

বসার ঘরে ঢোকার মুখে আমার সঙ্গে দেখা। তিনি উজ্জ্বল চোখে বললেন, এগারোটা গোলাপ এনেছে এগার ভ্যারাইটির।

আমি শুকনো গলায় বললাম, ও।

তুমি বোধহয় গোলাপ পছন্দ কর না?

জ্বি না। কোন কাজে আসে না, তাই পছন্দ করি না।

কাজে আসে না বলতে কী মিন করছ?

কুমড়ো ফুলের কথাই ধরুন। দেখতে সুন্দর। একে বড়া বানিয়েও খাওয়া যায়। গোলাপের নিশ্চয়ই বড়া হয় না। না-কি হয়?

তুমি কি ঠাট্টা করছ?

জ্বি না। ঠাট্টা করব কেন? আপনি বসুন, আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।

আমি বসার ঘরে ভদ্রলোককে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না। ব্যাটা থাকুক খানিকক্ষণ একা বসে। এক সময় বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে চলে যাবে।

জাজ সাহেবকে বসিয়ে রেখে আমি বেশ সময় নিয়ে চা খেলাম। মীরার সঙ্গে ঝগড়া করলাম। মীরার এখন ঝগড়া-রোগ হয়েছে। সবার সঙ্গেই ঝগড়া করছে। প্রেমে পড়লে মেয়েরা কি ঝগড়াটে স্বভাবের হয়? মীরার এবারের প্রেম বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে। ঐ ছোকরা বাড়ির সামনের রাস্তাতেই আস্তানা গেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সিগারেট হাতে সব সময় আছে। আমি খানিকটা খোঁজ-খবর নিয়েছি। জানলাম, সে রেডিও মেকানিক। এই নিয়ে কথা বলতে গিয়েই আপত্তি। আমি শুধু বলেছিলাম তোর ঐ খাতিরের মানুষটা রেডিও মেকানিক।

মীরা চোখ সরু করে বলল, তাতে অসুবিধা কি?

বখাটে ছেলেরা যারা কাজ-টাজ জোটাতে পারে না তারা শেষ বয়সে রেডিও মেকানিক হয়। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বসে থাকে।

স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে থাকলে তোর কি অসুবিধা?

আমার কোনোই অসুবিধা নেই। তোর অসুবিধা। যখন তখন তোর মাথায় স্ক্রু টাইট দিয়ে দেবে।

দিক।

আমার তো মনে হয় এখনি অনেকখানি টাইট দিয়ে দিয়েছে। আরো বেশি টাইট দিলে পাঁচ কেটে যাবার সম্ভাবনা।

আমাকে নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। দয়া করে নিজেকে নিয়ে ভাব।

আচ্ছা। পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলে টাকা-পয়সা নিয়ে পালাবি। তোর মেকানিক ব্যাটার হাতে একটা পয়সা নেই বলে আমার ধারণা। ঐদিন দেখলাম বাকিতে সিগারেট কেনার চেষ্টা করছে, দোকানদার দিচ্ছে না।

প্লিজ, তুই দয়া করে আমার সামনে থেকে যা।

আমি বসার ঘরে চলে এসে অবাক হওয়া গলায় জাজ সাহেবকে বললাম–আরে আপনি কখন এসেছেন?

ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তোমার সামনেই তো ঢুকলাম।

সরি, লক্ষ করি নি।

লক্ষ করি নি মানে?

বাসায় অনেক রকম ঝামেলা–মাথা ইয়ে হয়ে আছে.....

জাজ সাহেবের রাগ সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল। রাগের জায়গায় চলে এল কৌতূহল। তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ঐ নার্স মেয়ে কোনো সমস্যা করছে না-কি? কেইস করে দেয় নি তো?

জ্বি না। অন্য সমস্যা।

জাজ সাহেবের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া সরে গেল। তিনি হৃষ্ট গলায় বললেন আর কেইস যদি করেও মজা বুঝিয়ে দেব। বারো হাত কাঁকুড়ের পনের হাত বিচি দেখিয়ে দেব।

কেইস-ফেইস করবে না। ভদ্রমহিলার কোনো ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। কেইস করবে কি? খুবই চিন্তার মধ্যে আছি।

চিন্তার কী আছে? ট্রেস না পাওয়া গেলে তো ভালো কথা।

উনার মেয়েটা এখানে আছে—এই এক সমস্যা।

মেয়েটাকে এখনো নিয়ে যায় নি? বল কি! নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে। তুমি এক কাজ করমেয়েটাকে ওর কোনো আত্মীয়-বাড়িতে ফেলে দিয়ে আস। দেরি করবে না। করলে পরে পস্তাতে হবে।

দেখি।

না–দেখাদেখি না। যা করার এক্ষুনি কর। আমি এখন উঠি, দেখি বিকেলে খোঁজ নেব।

জ্বি আচ্ছা।

তুমি তো আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলে টুকু।

চিন্তার কিছু নেই। আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে লাভ হয় না। ভরসা রাখতে হয় বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর।

তাও ঠিক। আপনি তাহলে চলে যান, আমি দেখি কী করা যায়।

জাজ সাহেব চলে গেলেন। হঠাৎ লক্ষ করলাম, রাগে আমার শরীর কাঁপছে।

আজ সকাল থেকেই কেন জানি রাগ লাগছে। কোনোই কারণ নেই, তবু রাগ লাগছে। বাসার পরিস্থিতি ভালো। আনন্দময়। গত পরশু ছোট চাচা সবাইকে মহিলা সমিতিতে নাটক দেখিয়ে আনলেন। নাটক দেখে ফেরার পথে ঘোষণা করেছেন, আরেকটি গাড়ি কিলবেন। একটা গাড়িতে অসুবিধা হচ্ছে, দুটা হলে ভালো। একটা থাকবে ফ্যামিলির প্রয়োজনে, অন্যটি নিজের।

বড় চাচার মনও খুব উক্ষুণ্ণ। তিনি আরেকজন সাধুর খোঁজ পেয়েছেন। যিনি দিনরাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশ ঘন্টাই গাছে উঠে বসে থাকেন। গেছো ব্যাঙ-এর মতো গেছে

সাধু। এই সাধুনা-কি গত পাঁচ বছর ধরে মৌনব্রত পালন করছেন। দিন সাতেক হলো মৌনব্রতের কাল শেষ হয়েছে। এখন এর-তার সঙ্গে দু একটা কথা বলছেন। সেসব কথার বেশিরভাগই বোঝা যায় না।

আমি সহজ ভঙ্গিতে বলেছিলাম, গাছে থাকতে থাকতে বাঁদর হয়ে যায় নি তো? বাঁদরের ভাষায় কথা বলছে বলেই হয়ত সাধারণ পাবলিক বুঝতে পারছে না।

আমার কথায় সবাই হাসল; এমন কি বড় চাচাও হাসলেন। শুধু বড় চাচী হাসলেন না। তাঁর মনটা এখন খুব অস্থির। অস্থিরতার কারণ হচ্ছে তিনি আমেরিকা চলে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা কেউ কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছি না, কারণ বড় চাচার শরীর ভালো না। এদিকে চাচীর কোনো লক্ষ নেই। তাঁর কথাবার্তায় বার-বার আমেরিকা প্রসঙ্গ চলে আসছে। মেয়েদের কথা টেনে নিয়ে এসে বলছেন, না জানি ওরা কী কষ্ট করছে। এক হাতে সব করতে হয়। বাচ্চা দুটি হয়েছে মহাদুষ্ট। ছোটটা একবার ওভেনের দরজা খুলে চুপচাপ ভেতরে বসে ছিল। কেউ সুইচ টিপে দিলে কী অবস্থা হত ভেবে দেখ। ওদেরকে একা সামলানো কি সহজ কথা। ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে যায়।

আমরা বুঝতে পারি এসব হচ্ছে বড় চাচীর প্রস্তাবনা। তিনি চাচ্ছেন, আমরা বলি–আপনি চলে যান।

আমরা ভুলেও তা বলছি না। বড় চাচার শরীর খানিকটা খারাপ হলে হয়ত বলতাম, কিন্তু তাঁর শরীর অনেকখানিই খারাপ। গাছে চড়া সাধুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সারাক্ষণ ঝিম ধরে আছেন। সারাক্ষণ বসে থাকেন। শুতে পারেন না। বিছানায় গেলেই নাকি পেটে গ্যাস হয়। এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে চলে যাবার কথা তিনি ভাবেন কী করে কে জানে।

এর মধ্যে মেজো মেয়ের চিঠি পেয়ে চাচী আরো অস্থির হলেন। ওদের না-কি খুব। সমস্যা হচ্ছে। ছোট বাচ্চাটি সিঁড়ি থেকে পা মচকে ফেলেছে। বড় চাচী আমাদের সবাইকে কয়েকবার করে বলে ফেললেন–

আরেকটু হলে হাত-পা ভাঙত। মাথায় চোট পেত। কে জানে হয়ত পেয়েছে, আমাকে জানাচ্ছেনা। আসবার আগে এত করে বলে এলাম সিঁড়িগুলোতে বেড়া লাগিয়ে দিতে, নিশ্চয়ই লাগায় নি। আমেরিকাতে সিঁড়ি আটকানোর জন্যে প্রটেকটিভ ব্যবস্থা আছে। বিশ ত্রিশ ডলারে পাওয়া যায়। বাচ্চারা তখন আর সিঁড়ি ডিঙাতে পারে না। ঐ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে নি। আর করবেই বা কিভাবে? সে একা মানুষ, কদিক সামলাবে?

আমার মা বড় চাচীকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যাতে মাসখানিক অন্তত থাকেন। এক জন অসুস্থ মানুষকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যে অন্যায় এটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। বড় চাচী বললেন, আমি কি বুঝি না? তুমি কি ভাব চলে যাবার কথা ভাবতে আমার ভালো লাগছে? কিন্তু উপায় কি?

উপায় আছে। ওরা ওদের ব্যবস্থা করবে।

কী করে করবে? দেশে এক জন বিপদে পড়লে দশজন এগিয়ে আসেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবওখানে এইসব কোথায়?

জুন মাসের শেষের দিকের এক বৃহস্পতিবারে বড় চাচীর টিকিট কনফার্ম করা হল। সেই দিনই রাত দশটায় আমি তাঁকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পেলাম। বাসার সামনে একটা বেবিটেক্সি নিয়ে আসা হল।

বড় চাচী বেবিটেক্সি দেখে শুকনো গলায় বললেন, বেবিটেক্সি কেন? গাড়ি কোথায়? গাড়ি কোথায় আমরা কেউই জানি না। ছোট চাচা গাড়ি নিয়ে সেই সকালে বের হয়েছেন, এখনও ফেরেন নি। যদিও তিনি ভালো করেই জানেন আর্জ বড় চাচীর চলে যাবার দিন।

বড় চাচী বললেন, এয়ারপোর্টে কে কে যাচ্ছে? একটা বেবিটেক্সিতে হবে?

আমি বললাম, হবে, আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না।

তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, যাচ্ছে না কেন?

যাবার দরকার কি? এত রাতে খামাকা কষ্ট। গাড়ি থাকলেও একটা কথা ছিল। দেরি করে লাভ নেই, উঠে পড়ুন।

যথারীতি অত্যন্ত করুণ একটা বিদায়-দৃশ্যের অভিনয় হল। তিনি বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। জড়ানো গলায় বললেন ওদের কাছে দুতিন সপ্তাহ থেকে চলে আসব, আর যাব না। ভালো লাগে না। বাকি জীবনটা দেশেই কাটাব। উনারও শরীর খারাপ হয়েছে, সেবাযত্ন দরকার।

বড় চাচীর এ ধরনের কথার কোনোই গুরুত্ব নেই। প্রতিবারেই যাবার সময় এসব বলেন।

এয়ারপোর্টে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসালেন। এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হল যে, চারদিকে লোক জমে গেল।

ও টুকু রে, যত ঝামেলা শুধু তোর উপর দিয়ে যায়। তোর জন্যে আমার বড় কষ্ট হয় রে টুকু। দেখি তোর জন্যে কিছু করা যায় কি-না। জামাইকে বললে সে একটা ব্যবস্থা করবে। অনেক কংগ্রেসম্যানকে সে চিনে। ওদের কাছে ইমিগ্রেশনের কথা বললেই করে দেবে। তুই বায়োডাটা পাঠিয়ে দিস।

বাসায় ফিরতে রাত দুটো বাজল। এসে শুনলাম, বড় চাচার অবস্থা খুবই খারাপ। লক্ষণ দেখে মনে হয়, মাইল্ড স্ট্রোক জাতীয় কিছু হয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। খুব ঘাম হচ্ছে। পানির পিপাসা হচ্ছে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। হাসপাতালে নেবার কথা উঠতে আতঙ্কে অস্থির হচ্ছেন।

অস্পষ্ট গলায় বলছেন, না, না।

পাড়ার ডাক্তার বললেন, হাসপাতালের কথায় ইমোশনালি আপসেট হয়ে যাচ্ছে। এতে আরো খারাপ হবে। আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা এক জন হাইস্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আমার বাবা খুবই ভীতু ধরনের মানুষ। তিনি থর থর করে কাঁপছেন। প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, বাঁচবে তো ডাক্তার সাহেব?

হ্যাঁ, বাঁচবেন। আমার তো মনে হয় ভালো ঘুম হলে দেখা যাবে শরীর ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। হার্টের কোনো অসুখ বলে আমার মনে হচ্ছে না, যদিও সিম্পটমস্ সব এক। আমার মনে হচ্ছে, অসুখটা মানসিক। ভালোমতো বিশ্রাম নিলে সেরে যাবে।

অভিজ্ঞ ডাক্তাররাও মাঝে-মাঝে খুব অনভিজ্ঞের মতো করেন। বড় চাচার ওটা ছিল বড় ধরনের একটা এ্যাটাক। তাঁকে সময়মতো হাসপাতালে না নেয়ার কারণেই হয়ত শরীরের ডান দিকটা অচল হয়ে গেল। প্যারালিসিস। ডাক্তাররা খুব সান্ত্বনা দিলেন। ওটা কিছুই না। কমপ্লিট বেডরেস্ট। তারপর কিছু লাইট এক্সারসাইজ। এর বেশি কিছু লাগবে না। নাথিং।

সপ্তাহখানিকের বেশি রেস্ট নেয়া হল, লাইট এক্সারসাইজ করা হল; লাভ কিছু। হল না। অবশ হয়ে-যাওয়া অঙ্গে কোনো সাড়া ফিরে এল না। শুধু সন্ন্যাসী ভোলাবাবু ঘোষণা করলেন-কর্দমমান দিলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। নয়টা চলমান জলধারায় নির্মিত ঘাটের কাদার সঙ্গে নয় বদ্ধ জলাধারের ঘাটের কাদা মিশিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কলাগাছের ভেতরের শাঁস। অশোক গাছের পাতার রস এবং অর্জুন গাছের ছাল সিদ্ধ পানিও মেশাতে হবে। ঐ জিনিস রোগীর সারা গায়ে মাখিয়ে রোগীকে সারাদিন রোদে শুইয়ে রাখতে হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এতেই কাজ হবে।

অবশ্যই হবে। দ্রব্যগুণ আছে। ওতেই হবে।

কোনো মন্ত্রফন্ত্র নেই?

আছে। মন্ত্রও আছে। আপনারা মুসলমান মানুষ। আপনারা তো আর মন্ত্র পড়বেন না। আপনাদের জন্য শুধু দ্রব্যগুণ।

ঠিক আছে। আপনি আপনার কর্দমানের ব্যবস্থা করুন। হলে তো ভালো। টাকাপয়সা কেমন খরচ হবে?

টাকা-পয়সা খরচের জায়গা কোথায়? আমাকে গাঁজা কেনার কিছু দিলেই হবে। আর কিছু লাগবে না-ও, আর মাটির একটি গামলা।

ভোলাবাবু কর্দমস্নানের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। আমরা সবাই মোটামুটি খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। যেদিন কর্দমমান হবে তার আগের দিন বড় চাচার ছোট মেয়েটার চিঠি এসে উপস্থিত। দীর্ঘ চিঠি। পুরো চিঠি ইংরেজিতে লেখা। বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম হবে–

বাবা,

আমার আদর ও ভালবাসা নাও। গত পরশু মা এসে পৌঁছেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম, তোমার শরীর ভালো না। তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে মা চলে আসবেন, কল্পনাও করি নি। তোমরাই বা কী মনে করে তাঁকে ছাড়লে?

আমার এখানে এসে তিনি নানান রকমের সমস্যার সৃষ্টি করেন। যেমন সবার সব ব্যাপারে নাক গলানো। যেখানে তাঁর কথা বলার কিছু নেই, সেখানেও তিনি কথা বলবেন। যা শোর

না তাও তিনি শুনবেন। আমি আমার বরের সঙ্গে কী কথা বলছি, তা শোনার জন্যে আড়ি পাবেন।

আমি জানি এসব তিনি করেছেন আমার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এতে তেমন কোনো মঙ্গল হচ্ছে না। বরং অমঙ্গল হচ্ছে। তোমাদের জামাই পুরো ব্যাপারটায় খুব সঙ্গত কারণেই বিরক্ত হচ্ছে। তোমাকে আমি জানাতে চাই নি। তবু বাধ্য হয়ে জানাচ্ছি মা গত বছর হিউম্যান রাইটস এবং দেশের নারী সংঘের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন যে, আমার স্বামী আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। কী ভয়াবহ কথা চিন্তা করে দেখ। সেখান থেকে তদন্তের জন্যে লোক এসে উপস্থিত।

তোমাদের জামাই লজ্জায় এবং দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। সব পরিবারেই ঝগড়া হয়। ও যেমন চিৎকার করে, আমিও করি। এর মানে নারী নির্যাতন নয়। আমরা সুখেই আছি। ছোটখাট সমস্যা আমাদের অবশ্য আছে। তবে তা আমরা নিজেরাই দূর করব। মার হস্তক্ষেপ ছাড়াই করব।

মাকে আমরা দেশে ফেরত পাঠাতে চাই। তোমার চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের জন্যেও তাঁর থাকা দরকার। আমরা খুব চেষ্টা করছি দ্রুত মার টিকিটের ব্যবস্থা করতে। বাবা, এই চিঠির বিষয়বস্তু মা না জানলে ভালো হয়। জানলে তিনি কষ্ট পাবেন।

বড় চাচার কর্দমস্নান শুরু হল।

বেশ উত্তেজক দৃশ্য। লরেটা পর্যন্ত স্কুলে যায় নি। আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে।

বড় চাচাকে একটি চাটাইয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে মাটির গামলা ভর্তি কাদা ভোলাবাবু ডাল ঘোঁটার ঘুঁটনিতে প্রবল বেগে কাদা খুঁটছেন। কাদা মন্থর করে মাখনের মতো কিছু তুলতে চান কিনা কে জানে।

মীরা বলল, সন্ন্যাসী চাচা, এরকম করছেন কেন?

ভোলাবাবু মধুর স্বরে বললেন, কাদা মিহি বানাচ্ছি মা জননী। তাই নিয়ম।

ভোলাবাবু আমাকে ভাই ডাকলেও মীরাকে মা ডাকেন। আর মাকেও মা ডাকেন। বেলানটার দিকে ভোলাবাবুবললেন, এইবার কর্দমস্নান শুরু হবে। নটা পাঁচ মিনিটে লগ্ন শুভ। যদিও কেউ ছবি তুলতে চান ছবি তুলেন।

ঘরে ফিল্ম ছিল না একজন দৌড়ে গিয়ে ফিল্ম আনল। সেই ফিল্মে ছবি তোলা হল।

কর্দমমানের ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। স্নান শেষ হবার পর গোসল দেয়া হল। গোসলের পর দেখা গেল বড় চাচার শরীরের বাঁ অংশটাও এখন অচল। পুরো প্যারালিসিস।

ভোলাবাবু শীতল গলায় বললেন, সবই ভগবানের লীলা! আমাকে গরম এককাপ চা দিতে বলুন তো। কাদা ঘেঁটে ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

৮. মজার একটা খবর পাওয়া গেল

সকাল দশটায় মজার একটা খবর পাওয়া গেল। খবরটা হল–রিমির মা ফরিদা খালা বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের নাম সেলিম। বিয়েটা কয়েকদিন আগেই হয়েছে। খবর পাওয়া গেল আজ। বাইরের কারো মুখ থেকে খবর পাওয়া গেলে আমরা চট করে বিশ্বাস করতাম না। খবর দিলেন খালা নিজেই। টেলিফোন করে মাকে বললেন, বড় আপা, আপনাকে একটা খবর দিতে চাই। খবর দিতে লজ্জা লাগছে। কে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করে কে জানে। আমাদের নেচারই হচ্ছে নেগেটিভ সাইডটা আগে দেখা।

মা বললেন, খবরটা কি?

এই সমাজে মেয়েদের একা থাকা যে কী যন্ত্রণা, তা তো সবাই জানে। মেয়েদের একা থাকা অসম্ভব ব্যাপার। এক জন অভিভাবক লাগেই। তাছাড়া আপা, আপনি তো জানেন না রিমির বাবার দিকের আত্মীয়রা আমাকে কী রকম বিষদৃষ্টিতে দেখে। সারাক্ষণ চেষ্টা কী করে আমাকে ঠকাবে। ঐদিন রিমির মেজো চাচা আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার চাইল। আমি বললাম, এত টাকা আমি পাব কোথায়? এতে রেগেমেগে যেসব কথা বলল; আপনি শুনলে হার্টফেল করবেন।....

খবরটা কী সেটা আগে বল।

আপনি কিছু শোনেন নি?

না।

আমি বিয়ে করেছি বড় আপা। মাথার উপর যেন এক জন অভিভাবক থাকে এই জন্যে করা। রিমিও মত দিয়েছে।

রিমিও মত দিয়েছে?

হ্যাঁ। আসলে ও আমাকে ইনসিস্টও করেছে।

ফরিদা খালা দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। মার স্মৃতিশক্তি তেমন ভালোনা। বেশিরভাগ কথাই তিনি ভুলে যান কিন্তু টেলিফোনের কথোপকথনের পুরোটা তিনি গড় গড় করে আমাদের বললেন। দাঁড়ি-কমাও বাদ দিলেন না। বাড়ির মেয়েদের খুব দুঃখিত মনে হলেও তেমন দুঃখিত হয়ত তারা হল না। তাদের চোখে-মুখে চাপা উল্লাস। বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করে এই খবর ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা। দেখা গেল বাসায় প্রায় সবাই জানতো যে এরকম একটা কিছু হবেই। ভবিষ্যতে কী হবে, সেটাও দেখা গেল সবাই জানে।

মীরার ধারণা, সেলিম নামের এই, লোক ভুজুংভাজুং দিয়ে বাড়িটা নিজের নামে লিখিয়ে নেবে। টাকা-পয়সা হাত করবে। তারপর লাথি দিয়ে স্ত্রীকে খেদিয়ে দেবে।

ইরা অবশ্যি মীরার সঙ্গে একমত হল না। ইরার ধারণা, ফরিদা খালা ঐ লোকটার টাকা-পয়সা সব হাত করবে, তারপর লোকটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করবে।

ফরিদা খালার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে কি হবে না, এই নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হল। দুই রকম অভিমত পাওয়া গেল। এক দল বলছে, সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না। অন্যদল বলছে, রিমির কারণে সম্পর্ক রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে রিমিকে ঐ বাড়ি থেকে এনে এ বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই জাতীয় ক্রাইসিসে আমার সব সময় একটা ভূমিকা থাকে। বেশিরভাগ সময় আমাকে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এবারেও তাই হল। মা আমাকে ডেকে বললেন, তুই সন্ধ্যাবেলায় ঐ বাড়িতে যা। ব্যাপারটা কি ভালো করে জেনে আয়।

রিমির সঙ্গেও কথা বলবি। ওর মনোভাব জানবি।

আমি আঁৎকে উঠলাম। ঐ রাতের পর রিমিদের বাড়িতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। খালা জুতাপেটা না করলেও যা করবেন তাও কম না। আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, মেয়েরা কেউ গেলেই তো এসব ভালো জানতে পারবে।

আরে না। মেয়েরা গেলেই সন্দেহ করবে। কিছু বলতে চাইবে না। তোর বোকা বোকা চেহারা; তোকে কেউ সন্দেহ করে না। তুই সন্ধ্যার পর যা।

আমি আমার বোকা বোকা চেহারা নিয়ে সন্ধ্যার পর গেলাম। খালা বেশ সহজ স্বাভাবিক। আমাকে দেখে হাসিমুখেই তাকালেন। রিমিও বেশ স্বাভাবিক। সুন্দর শাড়ি পরে ঘুর ঘুর করছে। আমাকে বলল, বাবার দ্বিতীয় সংস্করণ কেমন দেখছিস? কাছে। গেলেই সেন্টের গন্ধ পাবি। ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বের হয়।

সেলিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। আগেও এ বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি, কখনো কথা হয় নি। আজ তিনি প্রচুর কথা বললেন। তৃতীয় বিশ্বে ক্ষমতা কী করে দখল করা হয়, এই বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। একাত্তরে ত্রিশ লাখ লোক মারা গেছে বলে চারদিকে যে প্রচার, এটার ভিত্তি কী সে সম্পর্কেও অনেক কথা বললেন, কথার ধরন ধারণ থেকে মনে হয়, বিরাট চালবাজ লোক। তবে ভদ্রলোকের চেহারা ভালো। স্মার্ট লোক। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কই ফরিদা, বেচারাকে কিছু খেতে-টেতে দাও। আমি বক্তৃতা দিয়ে তো বেচারার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি।

খালা চা-বিসকিট নিয়ে এলেন এবং অসম্ভব আদুরে গলায় বললেন, এই নিয়ে তোমার আট কাপ চা খাওয়া হল। আর কিন্তু চা হবে না।

ডোন্ট বি টু হার্ড অন মি।

অসম্ভব, আর তোমাকে চা দেব না। শেষে রাতে ঘুম হবে না। দেখ না টুকু, সারাদিন চুক চু করে চা খায়, তারপর রাতে ঘুম হয় না। জেগে থাকে। বাধ্য হয়ে আমাকেও জেগে থাকতে হয়। এই বয়সে কি আর রাতজাগা পোষায়, তুই বল?

এই রকম আদুরে মিষ্টি গলায় খালা কি তার আগের স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছেন? হয়ত বলছেন। বলাই স্বাভাবিক। তবে আমি শুনি নি। আমি সব সময় তাদের ঝগড়া করতেই দেখেছি। তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে কুৎসিত ঝগড়া। একবার আমার সামনেই ফরিদা খালা চেঁচিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে বাস করা আর রাস্তার এক কুকুরের সঙ্গে বাস করার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

খালু সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমাকে তুমি কুকুর বলছ? ফরিদা খালা শীতল গলায় বললেন, হা বলছি। এক শ বার বলছি। এখন তুমি আমাকে কী করবে? মারবে? মার। মারটা বাকি থাকে কেন? বউ মেরে হাতের সুখ কর। হাতের সুখ বাকি থাকে কেন?

সেই খালা আর এই খালায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। আজ তিনি কি সুন্দর করে কথা বলছেন। চেহারাটাও ভালো লাগছে। চোখে-মুখে আনন্দ ও সুখের ছাপ। খালাকে দেখতে ভালো লাগছে। বিয়ে করে কোনো অন্যায় করেছেন বলে আমার মনে হল না। মনে হচ্ছে, তিনি ঠিকই করেছেন। খালা বললেন, তুই খেয়ে যা। না খেয়ে যাবি না। পাবদা মাছ মটরশুটি দিয়ে রান্না করেছি। সেলিম সাহেব বললেন, সব রান্নায় তুমি খানিকটা মটরশুটি দিয়ে দাও কেন বল তো?

তুমি না বললে মটরশুটি তোমার ভালো লাগে। একবার বলেছিলাম, তারপর থেকে সবকিছুতেই মটরশুটি। আচ্ছা বাবা যাও, আর দেব না।

আমার সামনেই তাঁরা রাগ এবং অভিমান দেখাতে লাগলেন। আমার দেখতে ভালোই লাগল। রাতে তাঁদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। রিমি একের এর এক মজার মজার গল্প করে আমাদের হাতে লাগল।

একটা লোক গাড়ি করে যাচ্ছিল, এক্সিডেন্ট করল। ট্রাফিক পুলিশ জিজ্ঞেস করল— এক্সিডেন্ট হল কিভাবে? সে বলল, আমি খুব সাবধানী ড্রাইভার। গাড়ি চালাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে রিকশা। রিকশাকে সাইড দিলাম। তারপর দেখি একটা টেম্পো। টেম্পোকে সাইড

দিলাম। তারপর দেখি ঝড়ের বেগে ট্রাক আসছে। ট্রাককেও সাইড দিলাম। তারপর দেখি একটা ব্রিজ। ব্রিজটাকে সাইড দিতে গিয়েই এক্সিডেন্ট।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রিমির নতুন বাবা গড়িয়ে পড়লেন। একেকবার হাসি থামিয়ে তিনি বহু কষ্টে বলেন—সো ফানি। তারপর আবার হাসি।

খাওয়ার শেষে রিমি আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। আমি বললাম, যাই রিমি?

আচ্ছা যা। টুকু, একটা কথা শুনে যা।

বল।

আমার যদি কখনো চরম কোনো দুঃসময় আসেতুই কি আমার পাশে থাকবি?

থাকব।

তোর থাকা-না-থাকা অবিশ্য সমান। তুই তো মানুষ না। তুই হচ্ছিস মানুষের ছায়া। তবু থাকিস।

দুঃসময়টা কখন আসবে?

শিগগিরই আসবে। এক রাতে এই নব-দম্পতির ঘরের দরজার শিকলে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেব। তারপর বলব-মা এবং বাবা নাম্বার টু, আমি এখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি। পেট্রোল ঢালা হয়েছে। দেয়াশলাই জ্বালিয়ে আগুন দেব। তোমরা বাঁচার চেষ্টা কর।

তারপর খুব ঠাণ্ডা মাথায় তাই করব। আচ্ছা টুকু, তুই এক গ্যালন পেট্রোল যোগাড় করে দিতে পারবি?

আমি জবাব না দিয়ে চলে এলাম। রিমির পাগলামির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই আমি পরিচিত। তার পাগলামি চোখে পড়ার মত হলেও কখনো সীমা অতিক্রম করে না। আমি জানি, এইবারও করবে না—তবুবুকে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। কেন কছি জানি না।

বাসায় ফেরামাত্র ছোট চাচা বললেন, লরেটার এক দূরসম্পর্কের খালার সন্ধান পাওয়া গেছে। উনি এসেছিলেন। মেয়েটাকে নিতে রাজি হয়েছেন। তুই কাল ভোরে তাকে দিয়ে আসবি।

আমি যথারীতি বললাম, আচ্ছা।

৯. মানুষের মন বড়ই বিচিত্র

লরেটা ও আমি রিকশা করে যাচ্ছি। আমি বললাম, তোমার কি মন খারাপ?

না।

আমার তো খুব মন খারাপ লাগছে। তোমার কেন লাগছে না লরেটা?

তোমার কি কান্না পাচ্ছে?

হ্যাঁ।

কই; দেখি?

আমি তাকালাম লরেটার দিকে। লরেটা দেখল আমার চোখ জলে ভেজা। সে মমতাময়ী নারীর গলায় বলল, আমি যখন বড় হব তখন তোমাকে বিয়ে করব।

আমি বললাম, আচ্ছা। আমি কি মাঝে মাঝে তোমার খোঁজ নিতে আসব?

না।

যোগাযোগ তো থাকা দরকার। ধর, ঐ বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে গেলাম। তুমি তো জানবে না কোথায় গেছি।

বড় হয়ে আমি তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করব।

ঠিক আছে।

লরেটাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছি, সন্ন্যাসী ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। গায়ে কোনোই কাপড় নেই। আমাকে দেখেই এই যে এই যে বলে এগিয়ে এলেন। আমি আঁৎকে উঠলাম। ভাবলাম, নির্ঘাৎ কোন উন্মাদ।

টুকু সাহেব, ভালো আছেন? আমি তোলা।

ও আচ্ছা।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে পুরো নাঙ্গা হয়ে গেলাম।

তাই তো দেখছি।

শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, জ্বর-জ্বারি হচ্ছিল। একটু বৃষ্টিতেই জ্বর। নাঙ্গা হবার পর শরীরটা ঠিক হয়ে গেছে।

লজ্জা লাগছে না।?

প্রথম বারো ঘন্টা লজ্জা লাগে, তারপর আর লাগে না। চলুন এককাপ চা খাই।

এই অবস্থায় রেস্টুরেন্টে বসে চা খাবেন?

জ্বিনা। মাঠে বসব। ছোেট ছোট ছেলে আছে, তারা চা এনে দিবে। ভাইজান, টাকা আছে তো আপনার কাছে?

জ্বি আছে।

আমরা রেসকোর্সের মাঠে গিয়ে বসলাম। ভোলাবাবু বললেন, আচ্ছা, আপনার কি কখনো সাধু-সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছা করে?

না।

করলে সরাসরি নাঙ্গা হয়ে যাবেন। ঈশ্বরের ধ্যান-ট্যান কিছু করতে হবে না। শুধু মনটাকে হাল্কা করে ছড়িয়ে দেবেন। ওতে কাজ হবে।

উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।

আমি কিন্তু সাধু হিসেবে অনেক উপরের দরের। আপনি বোধহয় বিশ্বাস করছেন না।

না।

আপনার সম্পর্কে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হচ্ছে—আপনার জীবনটা কষ্টে কষ্টে কাটবে।

চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ধন্যবাদ।

সতের বছর এই রকম কাটবে, তারপর আপনার বিবাহ হবে। যে কন্যাটির সঙ্গে বিবাহ হবে সে আপনার চেয়ে খুব কম করে হলেও কুড়ি বছরের ছোট।

আমি তীক্ষ্ণ চোখে ভোলাবাবুর দিকে তাকালাম।

ভোলাবাবু হাসি হাসি মুখে তাকালেন। নরম গলায় বললেন, সতের বছর পর বুঝবেন—ভোলাবাবু নকল জিনিস না।

আমি কিছুই বললাম না।

ভোলাবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন–

খেপার মতন কেন এ জীবন,
অর্থ কী তার, কোথা এ ভ্রমণ,
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।

এই কবিতাটা কার লেখা বলুন তো? বলতে পারলেন না। আমিও জানি না। একবার শুনেছিলাম, মনে গেঁথে আছে। মানুষের মন বড়ই বিচিত্র টুকু সাহেব। বড়ই বিচিত্র।